উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

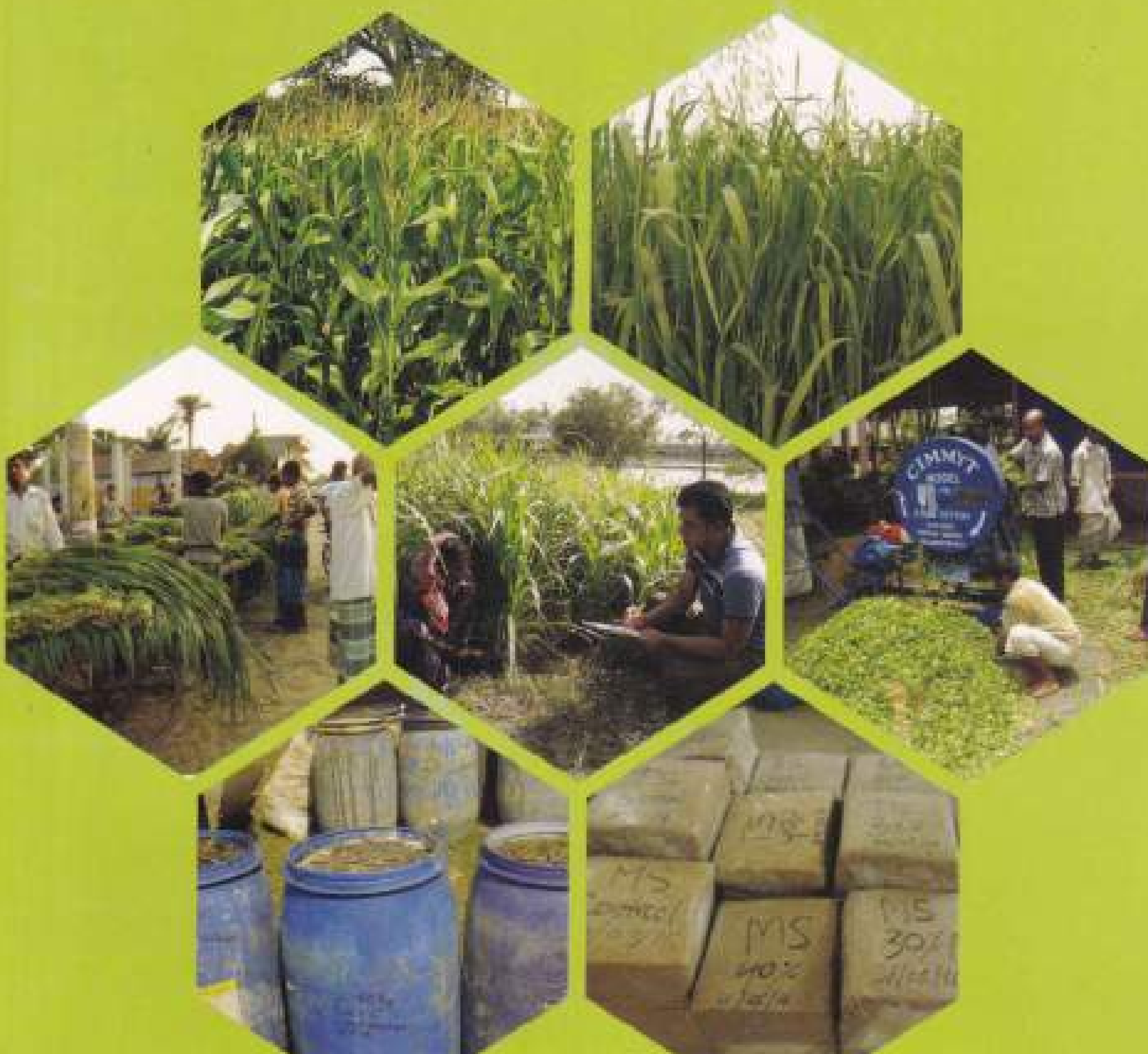

ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১।

উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রশিক্ষণ সহায়িকা

রচনা ও সম্পাদনায় : ড. নাথু রাম সরকার
মহাপরিচালক ও
প্রকল্প পরিচালক, ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প
বিএলআরআই, সাভার, ঢাকা।

ড. মোঃ আহসান হাবীব
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

মোহাম্মদ খোরশেদ আলম
পি.এইচ.ডি. রিসার্চ ফেলো, ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

মোঃ রুহুল আমিন
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

দিলরুবা ইয়াসমিন
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

ফারাহ্ তাবাসসুম
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

শামিম আহমেদ
পি.এইচ.ডি. রিসার্চ ফেলো, ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

মোঃ মোস্তাফিজার রহমান
পি.এইচ.ডি. রিসার্চ ফেলো, ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রথম সংস্করণ : ১০০০ (এক হাজার) কপি
প্রকাশ কাল : জুন ২০১৯
বিএলআরআই প্রকাশনা নং : ৩১১

প্রকাশনায় : ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)
সাভার, ঢাকা ১৩৪১।

ফোন : ৮৮-০২-৭৭৯১৬৭০-২
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭৭৯১৬৭৫
ই-মেইল : infoblri@gmail.com
ওয়েব-সাইট : www.blri.gov.bd

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার ডিজাইন : মোস্তাফিজুর রহমান শামীম
মুদ্রণে : কালার ইয়ার্ড
শুভেচ্ছা মূল্য : ২০০ (দুইশত) টাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	ব্যবহৃত শাব্দিক অর্থ (Glossary)	৬-১০
	ম্যানুয়ালের মডিউল পরিচিতি	১১
মডিউল-১	বাংলাদেশে ঘাস চাষের বর্তমান অবস্থা ও গুরুত্ব	১১-১৩
মডিউল-২	উচ্চ ফলনশীল ঘাসের শ্রেণীবিভাগ	১৪-১৬
মডিউল-৩	উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন ও গুণাবলী	১৭-৪১
৩.১	নন-লিগুমিনাস বহুবর্ষজীবি ঘাস	১৮-২২
৩.২	নন-লিগুমিনাস বর্ষজীবি ঘাস	২৩-২৫
৩.৩	লিগুমিনাস (ডাল-জাতীয়) মৌসুমী ঘাস	২৫-২৯
৩.৪	জলাবদ্ধ জমিতে চাষযোগ্য বহুবর্ষজীবি নন-লিগুমিনাস ঘাস	২৯
৩.৫	শস্য-বিন্যাসে ও সাময়িক পতিত জমিতে মিশ্র ঘাস চাষ	২৯-৩০
৩.৬	পাহাড়ী ঢালুতে ঘাস চাষ	৩০-৩১
৩.৭	লবণাক্ত এলাকায় ঘাস চাষ	৩১-৩২
৩.৮	বছর ব্যাপী ঘাস চাষ পরিকল্পনা	৩২-৩৪
৩.৯	ট্রি-ফডার	৩৪-৪১
মডিউল-৪	বাণিজ্যিকভাবে ঘাস উৎপাদন ও আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ	৪২-৫১
মডিউল-৫	গবাদি প্রাণীর খাদ্য উপাদান, শ্রেণীবিন্যাস এবং রেশন প্রস্তুতকরণ	৫২-৬০
মডিউল-৬	কাঁচা ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও নাইট্রেট বিষক্রিয়া	৬১-৭৯
মডিউল-৭	খাদ্য-শস্যের উপ-জাত প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার	৮০-৮৮

ব্যবহৃত শাব্দিক অর্থ (Glossary)

ফডার

ফডার হচ্ছে যে কোন কৃষিজজাত খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে এক প্রকার প্রাণিখাদ্য যা কেবলমাত্র গৃহপালিত প্রাণি যেমনঃ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, খরগোস, মুরগি ইত্যাদিকে খাওয়ানো হয়। প্রাণীরা নিজেরাই যা খেয়ে থাকে তা ছাড়া "ফডার" ঐ সকল খাদ্যকেই বুঝায় যা শুধুমাত্র প্রাণীকেই প্রদান করা হয় (প্রাণীকে সরবরাহকৃত কেটে আনা উদ্ভিদ সহ)। 'হে', শুকনা খড়, সাইলেজ, চাপ দেয়া বা পিলেট খাদ্য, তেল ও সুষম খাদ্য, অঙ্কুরোদমকৃত দানা বা লিগুম (স্প্রাউট) সবই ফডারের অন্তর্ভুক্ত।

ফরেজ

ফরেজ হচ্ছে গাছ বা গাছের অংশ বিশেষ যা গবাদি প্রাণী (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, খরগোস, উট ইত্যাদি) এবং বন্য পশুরা খেয়ে থাকে। প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত যে কোন প্রকারের ঘাস, উদ্ভিদ, তৃণমূল, লতা-পাতা যা প্রাণীরা নিজেরাই খেয়ে থাকে তাই হচ্ছে ফরেজ। আবার মানুষের খাদ্যের জন্য যে সকল গাছ লাগানো হয় সে সকল গাছ বা গাছের অংশকেও ফরেজ বলে।

ট্রি-ফডার

শক্ত কান্ড জাতীয় বৃক্ষ যার পাতা ও কচি কান্ড প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সে সকল ফডারকে ট্রি-ফডার বলে। যেমনঃ ইপিল-ইপিল, গ্লাইরিসিডিয়া, ক্লেমিস্তিয়া, সজনে ইত্যাদি।

কালটিভার

কোন বিশেষ প্রজাতির ফডার হতে উদ্ভিদ প্রজনন ও বাছাই প্রক্রিয়া কিংবা উদ্ভিদ জৈব প্রযুক্তি (মিউটেশন, টিস্যু কালচার, মলিকুলার বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রয়োগের মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত ঐ প্রজাতির এক বা একাধিক ভ্যারাইটি বা বিশেষ প্রকারকে কালটিভার বলে। যেমনঃ নেপিয়ার হাইব্রিড, পাকচং, বাজরা, অ্যারুসা ইত্যাদি হচ্ছে নেপিয়ারের কালটিভার।

শস্য-চক্র

শস্য-চক্র (বা ক্রপ রোটেশন) হচ্ছে এমন পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন যেখানে একই জমিতে ধারাবাহিক ভাবে এক ঋতুর পর আর এক ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয়। শস্য-চক্রের ফলে জমিতে সঞ্চিত বিভিন্ন ধরণের পুষ্টি উপাদানের ব্যবহার নিশ্চিত হয়। এতে, জমির ক্ষয়-রোধ হয় ও উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ফসল উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

শস্য নিবিড়তা

শস্য নিবিড়তা (ক্রপ ইনটেনসিটি) হচ্ছে একই জমিতে এক কৃষি বর্ষে কত সংখ্যক ফসল ফলানো যায়। শস্য-নিবিড়তা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছেঃ শস্য-নিবিড়তা = (সমগ্র ফসলি ভূমি ÷ প্রকৃত ফসল ফলানোর ভূমি) × ১০০। ধরা যাক, একজন কৃষকের ৫ বিঘা চাষযোগ্য জমি রয়েছে এবং খরিপ মৌসুমে সে ঐ ৫ বিঘা থেকে ফসল পেল। আবার সে রবি মৌসুমে ৩ বিঘা জমি চাষ করে ফসল উৎপাদন করালো। সুতরাং, বাস্তবে তার ৫ বিঘা জমি থাকলেও সে কার্যকরী ভাবে মোট ৮ বিঘা জমির ফসল পেল। অতএব, এক্ষেত্রে, সূত্রানুযায়ী শস্য-নিবিড়তা হ'ল (৫÷৮)×১০০ অর্থাৎ ১৬০%।

রিলে ফসল

রিলে ফসল হচ্ছে দ্বি-ফসলেরই এক প্রকার বিশেষ রূপ। দ্বি-ফসলের ক্ষেত্রে এক ফসল উঠে যাওয়ার পরে জমি পুণরায় চাষ দিয়ে আবার অন্য একটি ফসল ফলানো হয়। কিন্তু, রিলে ফসলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শস্যটি প্রথম শস্য কর্তনের আগেই বপন করা হয়, প্রথম ফসল উঠে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় না যেমনটি করা হয় দ্বি-শস্যের ক্ষেত্রে।

খরিপ ফসল

খরিপ ফসল হচ্ছে ঐ সকল ফসল যা বর্ষার শুরুতে (এপ্রিল-মে) চাষ করা হয় এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ফসল কর্তন করা হয়। প্রধান খরিপ ফসল হচ্ছে ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি।

রবি ফসল

রবি ফসল হচ্ছে ঐ সকল ফসল যা বর্ষার শেষ বা শীতের শুরুতে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) চাষ করা হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে ফসল কর্তন করা হয়। প্রধান রবি ফসল হচ্ছে গম, কালাই, শরিষা, মটর, খেসারি, কার্পাস ইত্যাদি।

ইন্টারক্রপিং/মিশ্রচাষ/সাথী ফসল/সমন্বিত চাষ

ইন্টার ক্রপিং হচ্ছে এমন একটি চাষ পদ্ধতি যেখানে একই জমিতে একই সাথে দুই বা ততোধিক ফসল ফলানো হয়। ইন্টারক্রপিং এর খুব সাধারন উদ্দেশ্য হচ্ছে জমির সকল পুষ্টি উপাদান বা পরিবেশগত সুবিধার সদ্ব্যবহার করে একই পরিমান জমি থেকে সর্বাধিক ফসল ফলানো, যা একক ফসল থেকে পাওয়া যায় না। ইন্টার ক্রপিং এ নন-লিগুমের সাথে লিগুম জাতীয় ফসল ফলালে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কন্ট্যুর চাষ পদ্ধতি

ভূমি-ক্ষয় রোধ করা জন্য ঢালুভাবে জমি চাষ করে ফসল উৎপাদনকে কন্ট্যুর চাষ পদ্ধতি বলে। পাহাড়ি ঢালু ভূমিতে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে যে ভাবে চাষ করা হয় এটিই কন্ট্যুর চাষ পদ্ধতি।

এ্যালি চাষ পদ্ধতি

এ্যালি চাষ পদ্ধতি হচ্ছে কাঠ জাতীয় বৃক্ষের দুই সারির মাঝে শস্য কিংবা ফডার চাষ পদ্ধতি। সাধারনতঃ যে সমস্ত বৃক্ষের মধ্যকার দূরত্ব অনেক বেশি (২০-৩০ ফুট) সে সকল বৃক্ষের দুই সারির মাঝে যথেষ্ট জায়গা থাকায় স্বল্প কালিন বা বর্ষজীবি উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়, এতে জমির অধিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। আমাদের দেশে জমির স্বল্পতার কারনে ফলজ বৃক্ষের মাঝে এ্যালি পদ্ধতিতে সহজেই ফডার চাষ করা যায়।

হার্ভেষ্ট

মানুষ কিংবা প্রাণী যে কারো খাদ্যের জন্য কৃষিজ উৎপাদিত যে কোন শস্য বা ফসল নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করাকেই হার্ভেষ্ট বলা হয়। অনেক সময় একে ফসল কাটা/কর্তণ বা ফসল সংগ্রহ/আহরণ বলে।

বায়োমাস

যে কোন ফসল চাষের উদ্দেশ্য হচ্ছে শস্য উৎপাদন। ধান গাছ চাষের উদ্দেশ্য ধান উৎপাদন। চা গাছ চাষের উদ্দেশ্য হচ্ছে চা পাতা উৎপাদন। তদ্রুপ ফডার চাষের উদ্দেশ্য হচ্ছে গবাদীপশুর খাদ্যের জন্য ঘাস উৎপাদন। একটি নির্দিষ্ট জমিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমান গবাদীপশুর খাদ্যযোগ্য কাঁচা ঘাস উৎপাদন হয় তাকে বায়োমাস ইল্ড বা ফলন বলে। একই পরিমান জমিতে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তদ্রুপ বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকারের ফডারের উৎপাদনেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি একই প্রজাতির অন্তর্ভূক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারাইটি বা উপজাতের ফডারের উৎপাদনেও সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

শস্য-উপজাত

মানুষের জন্য উৎপাদিত কৃষিজজাত খাদ্য হতে যে সকল উপকরণ উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট থাকে, যা জ্বালানী, কম্পোষ্ট/সার কিংবা প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেই সকল কৃষিজ অবশিষ্টাংশকে শস্য-উপজাত বলে। যেমনঃ ধান গাছের শীষ সংগ্রহ করার পরে অবশিষ্ট যে গাছটি থাকে, সেটি একটি শস্য-উপজাত যাকে ধানের খড় বলে। আবার ধান থেকে চাল সংগ্রহ করার পরে ধানের খোসা (যাকে কুড়া বলে) এবং ধানের ছোট ছোট ভাংগা (যাকে খুদ বলে) উপাদান গুলোকে শস্য-উপজাত বলে।

রাফেজ খাদ্য

সাধারনতঃ যে সকল খাদ্যে আঁশের পরিমান বেশি থাকে সেই ধরনের খাদ্যকে রাফেজ খাদ্য বলা হয়। রোমন্থক প্রাণীরাই রাফেজ জাতীয় খাদ্য যাবর কেটে হজম করতে পারে। কাঁচা ঘাস, যে কোন শস্যের খড় ইত্যাদি হচ্ছে আঁশ-জাতীয় খাদ্য। অরোমন্থক প্রাণী যেমনঃ পোল্ট্রি, বিড়াল, কুকুর এরা খাদ্যের ৫% এর উপর আঁশ হজম করতে পারেনা। আঁশ হজম করতে সেলুলেজ এনজাইম দরকার যা অ-রোমন্থক প্রাণীদের নেই।

দানাদার খাদ্য

আঁশ-জাতীয় খাদ্য ব্যতিত শস্য-দানার (গ্রেইন যা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়) উপজাত যা প্রাণিখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়-এ সকল প্রাণিখাদ্যকেই দানাদার খাদ্য বলে। দানাদার খাদ্যে সাধারনতঃ কম আঁশ এবং অধিক শক্তি কিংবা অধিক আমিষ কিংবা উভয়টিই বিদ্যমান থাকে। প্রাণীর সুষম রশদ তৈরী করতে দানাদার খাদ্য অত্যাবশ্যকীয়। যে কোন ডালের ছোলা, কুড়া, ভূষি, খৈল, সয়াবিন মিল, ভুট্টার গুড়া ইত্যাদি হচ্ছে প্রাণীর দানাদার খাদ্য।

রেশন

সাধারণত সুস্থ্য, সবল ও কর্মক্ষম জীবন যাপন করার জন্য ২৪ ঘন্টায় একটি প্রাণী বা পশুকে যে খাদ্য সমষ্টি প্রদান করা হয়, একে রেশন বা রসদ (Ration) বলে।

বেজাল ডাইট

বেজাল ডাইট বলতে ঐ ডাইটকে বুঝায় যাতে এমন পরিমান ক্যালরি বা শক্তি থাকে যা প্রাণীর দেহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদিত তাপের সমান ও এতে পর্যাপ্ত পরিমানে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান থাকে।

এডিএফ

সবুজ ঘাস এবং তৃণালতা-পাতা জাতীয় গো-খাদ্যের মধ্যে ফাইবার বা আঁশ প্রচুর পরিমানে থাকে। যে সমস্ত গবাদীপশু যাবর কাটে তারা এই আঁশজাতীয় খাদ্য চর্বন করে সহজেই পরিপাক করতে পারে। সবুজ ফরেজ বা ফডার কিংবা অন্যান্য রাফেজ বা আঁশ জাতীয় এই সব খাদ্যের একটা বিরাট অংশে অপরিপাচ্য কিছু জৈব পদার্থ যেমন লিগনিন, সেলুলোজ, সিলিকা এবং অদ্রবনীয় নাইট্রোজেন যুক্ত থাকে। ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণের সময় ফরেজ নমুনাকে এসিড ডিটারজেন্ট দ্রবনে সিদ্ধ করার পরে যে অবশেষ থাকে সেটিই হল ঐ ফরেজের এসিড ডিটারজেন্ট ফাইবার বা সংক্ষেপে এডিএফ। যে সমস্ত ফরেজে বেশী পরিমানে এডিএফ থাকে সেসমস্ত ফরেজের পরিপাচ্য এনার্জি বা শক্তি কম এডিএফ যুক্ত ফরেজের চেয়ে কম। এর অর্থ এই যে ফরেজে এডিএফের মাত্রা বাড়লে পরিপাচ্য শক্তির মাত্রা কমে যায়। সুতরাং সবুজ ঘাসের গুণগত মান বিবেচনা করতে এডিএফ নির্ণয় করা হয় এবং যে সমস্ত ঘাসে এডিএফ এর মাত্রা কম সে সমস্ত ঘাসের গুণগত মান ভাল।

এনডিএফ

নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবার, গবাদীপশুর খাদ্য বিশ্লেষণে ফাইবার বা আঁশের পরিমান নির্ণয়ের একটি অতি সাধারণ পদ্ধতি। সাধারনত ফরেজের গুণগত মান মূল্যায়নে অ-অম্লীয়, অ-ক্ষারীয় ডিটারজেন্ট দ্রবনে পরিপাক ক্রিয়া পরবর্তি ফাইবার বা আঁশের পরিমাপকেই নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবার বা সংক্ষেপে এনডিএফ বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বা ফরেজের মধ্যকার পেকটিন, প্রোটিন, দ্রবনীয় শর্করা বা সুগার এবং লিপিড বা শ্বেতসার দ্রবীভূত হয়ে উহার আঁশ জাতীয় উপাদান যথাঃ সেলুলোজ, লিগনিন এবং হেমিসেলুলোজকে পৃথক করে দেয় যা সহজে পরিপাচ্য নয় বিধায় প্রাণী খাদ্যে তা অপ্রত্যাশিত। প্রাণীর রেশন বা খাদ্যে এনডিএফের মাত্রা শুষ্ক উপাদান গ্রহন এবং জাবর কাটার সময়কে প্রভাবিত করে যদিও খাদ্যে এটার মাত্রা শক্তির মাত্রার সহিত বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ খাদ্যে এনডিএফ বেশী থাকলে শক্তি কম আর এনডিএফ কম থাকলে শক্তি বেশী থাকবে।

ড্রাইমেটার বা শুষ্ক পদার্থ

যে কোন ফ্রেস বা টাটকা খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি তার মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় পানি বা জলীয় পদার্থ থাকে। খাদ্যের মোট পরিমানের সাথে এই পানি বা জলীয় পদার্থ বাদ দিলে যে অংশটুকু (শুধু পুষ্টি উপাদান) অবশিষ্ট থাকে তাকেই ড্রাইমেটার বা শুষ্ক পদার্থ বলে।

মোট ড্রাইমেটার ইনটেক (ডিএমআই)

একটি প্রাণী তার স্বাভাবিক জীবনধারন ও উৎপাদনের জন্য দৈনন্দিন কতটুকু পুষ্টি উপাদান (ছয় প্রকার) পাবে তা তার দৈনন্দিন সর্বমোট খাদ্য গ্রহনের উপর নির্ভর করে। প্রতিটা প্রাণীরই বয়স ও উৎপাদনের পর্যায় ভেদে পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনে তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং প্রাণীর সঠিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য সঠিক মাত্রায় খাদ্য গ্রহন অপরিহার্য। প্রাণী যে কোন খাদ্য গ্রহন করলে পুষ্টি উপাদানের সহিত একই সাথে পানিও গ্রহন করে থাকে কারন প্রতিটা খাদ্যেই কমবেশী পানি রয়েছে। কাঁচা ঘাসে পানি অধিক পরিমানে থাকে আবার দানাদার খাদ্যে খুব কম পরিমান পানি জলীয় পদার্থ হিসাবে থাকে। পানি খাদ্য পরিপাক ও প্রাণীর যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তা অন্যান্য অপরিহার্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণ করেনা। সুতরাং প্রাণীর সঠিক পরিমানে পুষ্টি গ্রহণ নিশ্চিৎ করতে প্রাণীটি খাদ্যের জলীয় অংশ বাদে কতটুকু শুষ্ক পদার্থ গ্রহন করছে সেটাই পরিমাপ করা হয়। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিস্কার হবে। ধরা যাক, একটি গাভীকে ১০ কেজি কাঁচা ঘাস এবং অন্য একটি গাভীকে সেই একই ঘাস শুকিয়ে (হে তৈরী করে) ১০ কেজি সরবরাহ করা হল। সুতরাং দুটি গাভীকে একই ঘাস সমপরিমানে সরবরাহ করা হল এবং একই ঘাস বলে পুষ্টিমানের কোন পার্থক্য নেই। তাহলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে গাভী দুটি একই পরিমান পুষ্টি গ্রহন করেছে। কিন্তু না, দ্বিতীয় গাভীটিই বেশী পুষ্টি গ্রহন করেছে কারন একই পরিমান ঘাসে সেটিতে পানির পরিমান কম থাকায় পুষ্টি বেশী ছিল। সুতরাং লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে পশুকে শুধু বেশী আয়তনের খাদ্য দিয়ে পেট ভরালেই তার পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবেনা। সেই খাদ্যে কতটুকু শুষ্ক পদার্থ এবং পুষ্টিমান রয়েছে তা বিবেচনা করতে হবে। প্রাণী কোন খাদ্যের মাধ্যমে বেশী পরিমান শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ করছে সেটিও সেই খাদ্যের একটি বিশেষ গুণাবলী।

পরিপাচ্যতা

খাদ্যের সকল অংশই শরীরে পূর্ণমাত্রায় পুষ্টি উপাদানে পরিবর্তিত হয়না । এর কিছু অংশ পরিপাক প্রণালীর মাধ্যমে পুষ্টি উপাদানে পরিবর্তিত হয় এবং বাকী অংশ মল-মূত্র, গ্যাস এবং ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায় । সুতরাং, একটি খাদ্য শরীরের ভেতরে কতভাগ হজম হয়ে পুষ্টি উপাদানে পরিবর্তিত হয় তাকেই পরিপাচ্যতা বলা হয় । পরিপাচ্যতা খাদ্যের একটি দক্ষতাও বটে এবং সকল খাদ্যের পরিপাচ্যতা এক রকম নয় । আঁশ জাতীয় খাদ্যের তুলনায় দানাদার খাদ্যের পরিপাচ্যতা বেশী । আবার একই খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিপাচ্যতাও একরকম নয় ।

এনসাইলিং

বায়ুহীন পরিবেশে পর্যাপ্ত আর্দ্রতাযুক্ত (৬০-৬৫%) ফরেজ বা সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করলে এতে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়াকে এনসাইলিং বলে । সুতরাং, কাঁচা ঘাস সংরক্ষণের পুরো প্রক্রিয়াকেই এনসাইলিং বলা হয় বা সাইলেজ সংরক্ষণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকেই এনসাইলিং বলে ।

সাইলেজ

সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে অথবা সাইলেজ হলো গাঁজনকৃত সবুজ ঘাস । উচ্চ অর্দ্রতাযুক্ত সবুজ ঘাসকে বায়ুহীন পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয় । অন্য কথায়, এনসাইলিং প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত সবুজ ফডার বা ঘাসকে সাইলেজ বলে ।

সাইলো

সাইলেজ সংরক্ষণের স্থানকে সাইলো বলা হয় । যেমনঃ মাটির গর্তে সাইলেজ সংরক্ষণ করলে সেটিকে পিট সাইলো বলে । আবার ড্রামে সংরক্ষণ করলে সেটিকে ড্রাম সাইলো বলে । ডোলে সংরক্ষণ করলে সেটিকে ডোল সাইলো বলে ।

হে

হে হলো এক ধরনে শুকনো ঘাস যা কাচা ঘাসকে রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হয় । কাচা ঘাসের সকল পুষ্টিমানই হে তে পাওয়া যায় । সাধারণভাবে 'হে' বলতে শুকনা ঘাস বা সীমজাতীয় শুকনা ঘাসকে বুঝায় যার মধ্যে সর্বোচ্চ শতকরা ২০ ভাগ কিংবা তার চেয়ে কম পানি থাকে এবং যার মধ্যে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ (Dry matter) শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত থাকে ।

উইলটিং

উইলটিং হচ্ছে উদ্ভিদের এমন একটি অবস্থা যেখানে উদ্ভিদ কাটার কারণে পাতা বা অন্য নরম টিস্যুর কোষ থেকে টারগর বেড়িয়ে যায় । এই অবস্থাটি মাটিতে খরা বা রোগের ফলে কান্ড বা পাতার জাইলেম নালির ব্লকের কারণে পানির ঘাটতি থেকে হতে পারে । যখন ঘাসের সাইলেজ তৈরী করা হয় তখন উইলটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারন এর ফলে ঘাসের শুষ্ক পদার্থের শতকরা পরিমান বেড়ে যায় এবং উৎপাদিত অ্যাফ্লুয়েন্ট কমিয়ে দেয় । উইলটিং এর মাধ্যমে শুকানো ঘাসে সুগার আরো ঘনীভূত হয়, যা উৎপন্ন সাইলেজের পি.এইচ. উন্নীত করে । এর অর্থ সাইলেজ সংরক্ষণ করতে কম পরিমান অম্ল দরকার ।

চারণভূমি

যে সকল জমিতে গৃহপালিত গবাদি পশু যেমনঃ গরু, মহিষ, ছাগল-ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি চড়ে ঘাস, তৃণ লতা-পাতা, উদ্ভিদ কিংবা ফরেজ খায় সে সকল ভূমিকে চারণ ভূমি বলে ।

ভেজিটেটিভ বৃদ্ধি

বীজ অঙ্কুরোদগম থেকে উদ্ভিদের ফুল আসার মধ্যবর্তি সময়ের উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে ভেজিটেটিভ গ্রোথ/বৃদ্ধি বলে । এই পর্বে উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য মজুতে ব্যস্ত থাকে, যা পরবর্তিতে ফুল ও ফল উৎপাদন এবং বংশবিস্তারের জন্য প্রয়োজন হয় ।

কাট-এন্ড-কেরি

'কাট-এন্ড-কেরি' অন্য কথায় 'জিরো গ্রেজিং' (বা শূণ্য চারণ) হচ্ছে গৃহপালিত গবাদিপশুকে খাদ্য খাওয়ানোর এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সারা চারণ মৌসুমে প্রত্যেক দিন তাজা ঘাস কেটে এনে গৃহে আবদ্ধ প্রাণীকে খাওয়ানো হয় ।

অ্যারেবল জমি ও চাষ

অ্যারেবল জমি হচ্ছে ঐ সকল জমি যা চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী। আর অ্যারেবল চাষ বা ফার্মিং হচ্ছে এমন এক প্রকারের চাষ যা বিস্তৃত ভাবে বর্ষজীবি ফসল উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ ফসলের জীবন চক্র যা অঙ্কুরোদগম থেকে শুরু করে বীজ উৎপাদন এক বছরের মধ্যে সমাপ্ত হয়।

ইনভেসিভ উদ্ভিদ

ইনভেসিভ উদ্ভিদ হচ্ছে এলিয়েন প্রজাতির উদ্ভিদ যে গুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছড়িয়ে পরে। ইনভেসিভ উদ্ভিদ সাধারনতঃ কোন বিশেষ স্থানের দেশীয় প্রকৃতির কোন উদ্ভিদ নয় (বাইরে থেকে আমদানীকৃত প্রজাতি) এবং এগুলো এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যা পরিবেশ, মানুষের অর্থনীতি অথবা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

মালচিং

মালচিং এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে খড়, কম্পোষ্ট, অর্ধ-পঁচা শাক সবজি কিংবা প্লাষ্টিক সিট দ্বারা উদ্ভিদের চারপাশে মাটির উপরে ঢেকে দেয়া হয় যাতে করে ভূমি ক্ষয়-রোধ, মাটির জলীয় পদার্থ ধরে রাখা, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং আগাছা বৃদ্ধি দমন করা হয়।

বেজাল ডোজ

উদ্ভিদের প্রাথমিক বৃদ্ধির জন্য জমি প্রস্তুতির সময় ন্যূন্যতম যে সার প্রয়োগ করা হয় তাকেই বেজাল ডোজ বলে। জমি লাঙ্গল বা চাষ দেয়ার সময়ই নির্ধারিত মাত্রায় জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা হয় যাকে বেজাল ডোজ বলা হয়।

টপ ড্রেসিং

বীজ বপন ও অঙ্কুরোদগমের পরে উদ্ভিদ দাঁড়ানো অবস্থায় জমিতে সার ছিটিয়ে দেয়াকে টপ ড্রেসিং বলে। খনিজ অজৈব সার যা খুব সহজেই পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় এ ধরণের উপাদানকে প্রায়ই টপ ড্রেসিং হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা হয়। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ এবং সোডিয়াম নাইট্রেট সহ নাইট্রোজেন সার, সকল পটাসিয়াম সার এবং সুপার ফসফেট এর অর্ন্তভূক্ত। উদ্ভিদের পুষ্টি ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে টপ ড্রেসিং করা হয়ে থাকে।

কেইল করা

বীজ বপনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে যখন সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করা হয় তখন মাটির নীচে বীজ বপনের জন্য সারি বরাবর গর্ত তৈরী করাকে কেইল করা বলে। সমান ভাবে লাইন করার জন্য দুই মাথায় দুটি খুঁটি পুঁতে লম্বালম্বিভাবে রশি বেঁধে রশি বরাবর একটি শক্ত কাঠি বা লাঙ্গলের ফলা চালনা করলে দুইপাশে মাটি সরে গিয়ে গর্ত তৈরী হয়, একেই কেইল তৈরী করা বলে।

ইউ.এম.এস

এটি গবাদি প্রাণীর একটি খাদ্য প্রযুক্তির নাম। নির্দিষ্ট মাত্রায় ইউরিয়া ও চিটাগুড়ের দ্রবণ তৈরী করে তা শুকনা খড়ে মিশিয়ে গবাদি প্রাণীর যে খাদ্য তৈরী করা হয় তাকে ইউ.এম.এস বলে। এতে শুকনা খড়ের খাদ্যমান বেড়ে যায়, প্রাণীর খাদ্য গ্রহন ও পরিপাচ্যতা উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

ডেইরী প্রাণী

দুগ্ধ উৎপন্নকারী গৃহপালিত প্রাণীকেই ডেইরী বলে। গাভীর ক্ষেত্রে বলা হয় ডেইরী কাউ, দুগ্ধদানকারী মহিষকে ডেইরী বাফেলো এবং দুগ্ধদানকারী ছাগলকে ডেইরী গোট বলা হয়।

ফিড এডিটিভ

ফিড এডিটিভ হচ্ছে প্রাণীর জন্য অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদানের সংযুক্তি থাকা কোন ঔষধ। সেটা হতে পারে ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, খনিজ উপাদান, ফার্মাসিউটিক্যাল, ফাংগাল উৎপাদন এবং স্টেরয়ডাল যৌগ। এডিটিভ খাদ্য উপস্থাপন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিপাচ্যতা অথবা অন্ত্রীয় স্বাস্থ্যের ক্রিয়ায় প্রভাব রাখে।

ম্যানুয়ালের মডিউল পরিচিত

এই ম্যানুয়ালে মোট ৭ টি মডিউল রয়েছে। তন্মধ্যে, মডিউল ১ এ বাংলাদেশে ঘাস বা ফডার উৎপাদনের একটি চিত্র দেয়া হয়েছে এবং মডিউল ২ থেকে ৬ পর্যন্ত ফডার চাষের করণীয় ও অনুসরণীয় পন্থা সমন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও মডিউল-৭ এ শস্য উপ-জাতের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

মডিউল-১

বাংলাদেশে ঘাস চাষের বর্তমান অবস্থা ও গুরুত্ব

আলোচিত বিষয় সমূহ

১.১. ঘাস বা ফডার চাষের গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা সমন্ধে খামারীদের প্রাথমিক ধারণা

১.২. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে খামারীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবেঃ

- ঘাস চাষের গুরুত্ব সমন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।
- ঘাস চাষের বর্তমান পরিস্থিতি সমন্ধে ধারণা লাভ করবে।
- প্রাণি খাদ্যের বর্তমান অবস্থা সমন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।

১.১ ঃ বাংলাদেশে ঘাস চাষের বর্তমান অবস্থা ও গুরুত্ব

ভূমিকাঃ বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রাণী খাদ্য একটি প্রধান সমস্যা। আমাদের দেশে প্রাণিসম্পদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্যে শস্য উপজাতই প্রধান। শস্য উপজাত হিসেবে আমরা প্রধান ফসল যেমন- ধান, গম, ভূট্টা, ডাল প্রভৃতি থেকে খড়, ভূষি পেয়ে থাকি এবং এগুলো গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত উপজাতের খাদ্যমান খুবই কম, যা গবাদিপশুর দৈহিক ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, প্রাণিসম্পদ থেকে দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য কাঁচা ঘাসের কোন বিকল্প নাই। প্রাপ্য তথ্য ও উপাত্ত অনুসারে দেখা যায় যে, আমাদের দেশের গবাদিপশুর জন্য কাঁচা ঘাসের প্রাপ্যতা মাত্র ১.০ কেজির মত; যা বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন- রাস্তারপার, অনাবাদি জমি, বাড়ীর আশপাশ, বাঁধ প্রভৃতি থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

দেখা গেছে গবাদি প্রাণীর জন্য দেশে বিভিন্ন উৎস থেকে সর্বমোট আঁশ-জাতীয় খাদ্য উৎপাদিত হয় প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন শুষ্ক পদার্থ যা চাহিদার প্রায় ৬০ ভাগ। আবার বিভিন্ন উৎস থেকে দানাদার খাদ্য উৎপাদিত হয় প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন শুষ্ক পদার্থ যা চাহিদার প্রায় ২২ ভাগ। অন্য একটি তথ্যে আমাদের দেশের গৃহপালিত বিভিন্ন গবাদি প্রাণী ও পোল্ট্রির আঁশ ও দানাদার খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাপ্যতা নিম্নে সারণী-১ এ উল্লেখ করা হ'লঃ

সারণী ১ঃ বিভিন্ন প্রাণীর আঁশ ও দানাদার খাদ্যের চাহিদা ও সরবরাহ

প্রাণীর ধরণ	চাহিদা (মিলিয়ন মেট্রিক টন)			সরবরাহ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)		
	আঁশ-জাতীয় খাদ্য	দানাদার খাদ্য	সর্বমোট	আঁশ-জাতীয় খাদ্য	দানাদার খাদ্য	সর্বমোট
গরু	৩.২৩৩	০.৩৮৫	৪.৬১৮	১.১৪৭	০.১৯৯	১.৩৪৬
মহিষ	০.১১৫	০.০৪৯	০.১৬৪	০.০২৫	০.০০৭	০.০৩২
ছাগল	০.৪২২	০.০৭৫	০.৪৯৭	১.২২৩	০.০০৯	১.২৩২
ভেড়া	০.০৫২	০.০০৯	০.০৬১	০.১৫৩	০.০০৭	০.১৬০
পোল্ট্রি	০.০০৬	৩.০৩৯	৩.০৪৫	০.০৭৯	০.৩৬১	০.৪৪০
সবগুলো	৩.৮২৮	৪.৫৫৭	৮.৩৮৫	২.৬২৭	০.৫৮৩	৩.২১০

উৎসঃ এফএও-এপিএইচসিএ আঞ্চলিক কর্মশালা, ব্যাংককঃ ১৩-১৫ ই আগষ্ট, ২০১৩।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস, ২০০৬) এর তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কৃষি জমির পরিমাণ ১৪.৫৮ মিলিয়ন হেক্টর, তন্মধ্যে শতকরা ৫৫.৫ ভাগ ফসল উৎপাদনের জন্য চাষ করা যায়, শতকরা ২৪ ভাগ এখনো চাষাবাদের জন্য ব্যবহার হচ্ছে না, শতকরা ১৮.০ ভাগ বনসম্পদ এবং প্রায় শতকরা ৩ ভাগ পতিত থাকে। প্রতি বছর এই আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮০-৮১ সালে যেখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৮.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর, সেখানে ২০০০-০১ সালে ৮.০৪ মিলিয়ন হেক্টরে দাঁড়িয়েছে এবং ২০০৫-২০০৬ সালে এর পরিমান হয়েছে ৭.৯৮ মিলিয়ন হেক্টর। প্রতি বছর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ২২.২৭ হাজার হেক্টর হারে কমে যাচ্ছে। বিবিএস (২০০৬) এর তথ্য মতে, বাংলাদেশের চাষযোগ্য জমির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ধান, ৪.৬৭ ভাগ ডাল জাতীয় শস্য, ৩.৯২ ভাগ গম, ৩.৭৭ ভাগ তৈল জাতীয় শস্য, ৩.৭ ভাগ পাট, ১.২৩ ভাগ আঁখ, ১.১১ ভাগ আলু, এবং ১.৩৯ ভাগ শাক-সব্জি উৎপাদনে ব্যবহার হচ্ছে এবং শস্য নিবিড়তা ৮২ ভাগ থেকে ২১৫ ভাগ ও গড়ে প্রায় ১৭৭ ভাগ। এই ধরনের একটি শস্য নিবিড়তায় ঘাস উৎপাদনের জন্য চারণ ভূমির সংরক্ষণ অতীব জরুরী। কেননা শস্য উৎপাদনের সাথে প্রানীসম্পদের একটি প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

বিবিএস (২০০৬) তথ্য অনুসারে আমাদের দেশে রাস্তার পাড়, বাঁধ, পতিত জমি মিলে প্রায় ০.৬ মিলিয়ন হেক্টর চারণ ভূমি রয়েছে। যদিও এ সকল চারণ ভূমিতে বছরের একটা সময়ে কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক ঘাস উৎপন্ন হয় এবং যার উৎপাদন দক্ষতার পরিমান কাঁচা অবস্থায় হেক্টর প্রতি প্রায় ২০ টন। কিন্তু শুষ্ক সময়ে বিশেষ করে ডিসেম্বর-এপ্রিল মাসে এ সকল চারণ ভূমিতে কোন কাঁচা ঘাস থাকে না। ফলে এখান থেকে প্রাণী তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিমান খাদ্য আহরণ করতে পারে না।

এছাড়াও বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ এলাকায় যেমন বাঘাবাড়ী মিল্কভিটা, যা বাথান নামে পরিচিত, সেখানে প্রায় ৬০০০ হেক্টর জমি চারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ সকল চারণ ভূমি পলি বিধৌত এবং সেখানে শীত মৌসুমে শীম জাতীয় ঘাস

বিশেষ করে খেসারী ও মাটি কালাই চাষ করা হয়ে থাকে এবং বছরের নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত খামারীরা এগুলো ডেইরীর জন্য ব্যবহার করে থাকে। খেসারী খাওয়ানোর পর এই সকল চারণ ভূমি প্রাকৃতিক ঘাসে পরিপূর্ণ হয় এবং বর্ষা আসা পর্যন্ত এগুলো ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের চারণ ভূমি সিরাজগঞ্জের বাথান এলাকা ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য মিল্ক পকেট এলাকা সমূহ যেমনঃ মানিকগঞ্জ, পাবনা, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল এবং মাদারীপুরে দেখতে পাওয়া যায়। চারণ ভূমি ও দুগ্ধ উৎপাদনে প্রাচুর্যতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সকল এলাকা সমূহকে মোট ১১ (এগারটি) সম্ভাব্য দুগ্ধ উৎপাদনকারী জোন হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ জোন-১ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় জেলা); জোন-২ (নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী); জোন-৩ (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল); জোন-৪ (শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা); জোন-৫ (ঢাকা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ); জোন-৬ (কুষ্টিয়া, পাবনা, ঝিনাইদহ); জোন-৭ (ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর); জোন-৮ (কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী); জোন-৯ (সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ); জোন-১০ (যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা) এবং জোন-১১ (চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান)। উপরোক্ত জোন সমূহে যে সকল চারণ ভূমি বিদ্যমান তা সংরক্ষণের আওতায় এনে ডেইরী উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করে দেশের দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

তাছাড়া, বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে পরিমাণ গবাদিপশু বিদ্যমান তাদের জন্য প্রতি বছর প্রায় ৩০০ থেকে ৬০০ পেটা জুলস শক্তি দরকার এবং এই ৩০০ থেকে ৬০০ পেটা জুলস শক্তির জন্য প্রায় ২৫শতাংশ শক্তি গবাদিপশু যাতে চারণ ভূমি থেকে সংগ্রহ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং গবাদিপশুর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে প্রায় ৩ থেকে ৬ মিলিয়ন হেক্টর চারণ ভূমির দরকার। এই ৩ থেকে ৬ মিলিয়ন হেক্টরের অর্ধেক থাকতে হবে চারণ ভূমি এবং বাকী অর্ধেক কমিউনিটি ভূমি যেমন, বাঁধ, রাস্তার পাড়, প্রভৃতি থাকতে পারে। তা হলেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। মোট কথা একটি গবাদিপশু প্রতিদিন তার চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগ যাতে চারণ ভূমি থেকে আহরণ করতে পারে এ ধরনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তা হলেই লাভজনক ভাবে ডেইরী ফার্ম পরিকল্পনা করা যাবে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, চারণ ভূমি শুধু গবাদিপশুর জন্যই জরুরী নয়, পরিবেশ রক্ষার জন্যও জরুরী। গবেষণায় দেখা গেছে যে, চারণ ভূমিতে প্রাকৃতিক ঘাস মৃত্তিকার জৈব পদার্থ বৃদ্ধিসহ কার্বন সংরক্ষণে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতি হেক্টর চারণ ভূমি প্রতি বছর প্রায় ০.১১ থেকে ৩.৪ টন কার্বন সংরক্ষণ করতে পারে এবং এর ফলে পরিবেশের উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনে অনুকুল ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

লাভজনক গবাদিপশুর খামারের জন্য ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পূর্বে আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক চারণভূমি ছিল সেখানে চরে-বেড়িয়ে গবাদিপশু তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাত। বর্তমানে সে সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, তাই গাভী এবং ছাগল প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাতে খামারীদের অবশ্যই গবাদি পশু থেকে আশানুরূপ উৎপাদন পেতে উচ্চফলনশীল ঘাসের আবাদ করতে হবে। বাংলাদেশে ঘাসের প্রাপ্যতা এলাকা ও ঋতু-ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। নীচু নদী অববাহিকায় সাধারণতঃ শুষ্ক মৌসুমে ঘাসের প্রাপ্যতা বেশী আবার উঁচু এলাকায় বর্ষা মৌসুমে সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতা বেশী। তবে, কোথাও সারা বছর ঘাসের প্রাপ্যতা একই রকম হয় না। অথচ, লাভজনক দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য সারা বছর ঘাস সরবরাহ প্রয়োজন।

মডিউল-২
উচ্চফলনশীল ঘাসের শ্রেণীবিভাগ

আলোচিত বিষয় সমূহ

২.১. উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের শ্রেণীবিন্যাস সমন্ধে প্রাথমিক পরিচিতি

২.২. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পাবে

- পুষ্টির গুণাগুন ভেদে বিভিন্ন ঘাসের পরিচিতি লাভ করবে
- লিগুমিনাস ও নন-লিগুমিনাস ঘাস চিনতে পারবে
- বর্ষজীবি ও বহুবর্ষজীবি ঘাস সমন্ধে জানতে পারবে।
- মাটির ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত ঘাস বাছাই সম্পর্কে ধারণা পাবে।

২.৩ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব

- প্রশিক্ষক মাঠে গিয়ে বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন এবং কোন ঘাস কেমন মাটি ও কেমন আবহাওয়ায় চাষ করা যায় তার ধারণা দিবেন।
- মাঠে ঘাস প্রদর্শনের পরে প্রশিক্ষক ক্লাসে লিগুম-ননলিগুম, শুষ্ক ও জলাবদ্ধ মাটি, একবর্ষী ও বহুবর্ষী ঘাসের ছক একে প্রশিক্ষণার্থীদের ছক পূরণ করতে বলবেন।

উন্নতজাতের ঘাসের শ্রেণীবিভাগ

১। পুষ্টি গুণাগুণ ভেদে

ক) লিগুমিনাসঃ যে কোন ধরনের ডাল বা শিম জাতীয় অধিক আমিষ যুক্ত ঘাস। যেমন: মাটি কালাই, খেসারী, কাউপি, অরহর, ধৈঞ্চা, আলফালফা, ইপিলইপিল ইত্যাদি।

খ। নন-লিগুমিনাসঃ সাধারনত কম আমিষ যুক্ত ঘাস যেমনঃ নেপিয়ার, জার্মান, পারা, ভূট্টা, এন্ড্রোপোগন, স্পেন্ডিডা, দল, নেপিয়ার, জাম্বু ইত্যাদি।

২। মাটির ধরন ভেদে ঘাসের শ্রেণীবিভাগঃ

ক) শুষ্ক/উঁচু জমির ঘাসঃ যে সমস্ত ঘাস শুষ্ক বা উঁচু জমিতে চাষ হয়। যেমনঃ নেপিয়ার, ভূট্টা, জাম্বু, ওট ইত্যাদি।

খ) নীচু/জলাভূমির ঘাসঃ যে সমস্ত ঘাস নীচু কিংবা জলাভূমিতে চাষ হয়। যেমনঃ জার্মান, পারা, দল ইত্যাদি।

নেপিয়ার ঘাস

জাম্বু ঘাস

৩। জীবনকাল ভেদে ঘাসের শ্রেণীবিভাগঃ

ক) একবর্ষজীবি ঘাসঃ যে সমস্ত ঘাস বছরে একবার নির্দিষ্ট সময়ে চাষ করা যায়। যেমনঃ যে কোন ধরনের কালাই, খেসারী, কাউপি, জাম্বু, ভূট্টা ইত্যাদি।

খ) বহুবর্ষজীবি ঘাসঃ যে সমস্ত ঘাস সারা বছরে যে কোন সময়ে চাষ করা যায় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ বেঁচে থাকে। যেমনঃ নেপিয়ার, জার্মান, পারা, দল, আলফালফা, ইপিলইপিল ইত্যাদি।

ভূট্টা ঘাস

ওট ঘাস

ট্রিটিকেলি ঘাস

আলফালফা ঘাস

কাউপি ঘাস

জার্মান ঘাস

পারা ঘাস

দল ঘাস

৪ । লিগুমিনাস জাতীয় ঘাসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) ট্রি লিগুমিনাসঃ বৃক্ষ জাতীয় গাছ, যা অনেক বড় হয় । যেমনঃ ইপিলইপিল, ফ্লেমিঞ্জিয়া, গ্লাইরিসিডিয়া, অরহর ও সজনে প্রভৃতি ।

খ) মৌসুমি লিগুমিনাসঃ এগুলো বছরের বিশেষ সময়ে (প্রধানতঃ শীতকালে) হয়, যেমনঃ খেসারী, মাটিকালাই, ধৈঞ্চা, কাউপি প্রভৃতি ।

গ্লাইরিসিডিয়া

ফ্লেমিঞ্জিয়া

ইপিলইপিল

ধৈঞ্চা

খেসারী

মডিউল-৩
উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন ও গুণাবলী

আলোচিত বিষয় সমূহ

৩.১. উন্নত জাতের ঘাসের বৈশিষ্ট্য ও চাষাবাদ পদ্ধতি

৩.২. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পাবেঃ

- উন্নত জাতের ঘাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবে।
- অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ঘাস চাষ সমন্ধে জানতে পারবে।
- লিগিউম বা নন-লিগিউম জাতীয় ঘাস চাষ সমন্ধে ধারণা পাবে।
- জলাবদ্ধ বা লবনাক্ত এলাকায় ঘাস চাষ বিষয়ে ধারণা পাবে।
- পাহাড়ি এলাকার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ঘাস চাষ বিষয়ে ধারণা পাবে।
- সমন্বিত ঘাস চাষ (লিগিউম ও নন-লিগিউম একত্রে চাষ) সম্পর্কে ধারণা পাবে।
- বিভিন্ন ধরনের ঘাস কর্তনের সময়, উৎপাদন, গুণাগুণ সমন্ধে ধারণা পাবে।
- সারা বছরব্যাপী ঘাস চাষ বিষয়ক পরিকল্পনা সমন্ধে ধারণা পাবে।

৩.৩ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব

উন্নত জাতের ঘাস চাষ সমন্ধে পরিচিতি ও আলোচনার আগে প্রশিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়ে খামারীদের সাথে মত বিনিময় করতে পারেঃ

- উন্নত জাতের ঘাস সমন্ধে প্রশিক্ষণার্থীদের কোন ধরণের জ্ঞান আছে কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ঘাস চাষ পদ্ধতি সমন্ধে কোন ধারনা আছে কি না সে বিষয়ে জানা
- ধারনা থাকলে খামারীদের বা প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে উন্নত জাতের ঘাস চাষ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনার সুযোগ দেয়া।
- একটি নির্দিষ্ট ঘাস নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় চাষ করতে কি কি করনীয় (জমি চাষ, সার, বীজ, সেচ, আগাছা দমন, ফসল কর্তন, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়) তা খামারীদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়া।

উন্নত জাতের ঘাসের বৈশিষ্ট্য, চাষ পদ্ধতি, ফলন ও গুণাগুণ

৩.১ নন-লিগুমিনাস বহুবর্ষজীবি ঘাস

বিএলআরআই নেপিয়ার-১ (*Pennisetum purpurium*)

নেপিয়ার বাজরা জাতের একসেসন সিলেকশন করে বিএলআরআই নেপিয়ার-১ ঘাসটি তৈরী করা হয়েছে। এটি একটি বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস কাটা যায়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস উত্তম সময়। কার্তিক বা অগ্রহায়ন মাসে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সংগে সংগে কাটিং বিছিয়ে দিলে নেপিয়ার ঘাস সহজেই উৎপন্ন করা যায়। এ সময়ে একই সাথে মিশ্র ফসল হিসেবে মাসকালাই বা খেসারীর বীজ বুনানো যেতে পারে। মাসকালাই বা খেসারী কাটার পর মাটি কোদাল দিয়ে একটু আলগা করে সার ও পানি প্রয়োগ করলে অধিক ফলন আশা করা যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব ধরনের মাটি এমনকি পাহাড়ী ঢাল এবং সীমিত লবনাক্ত জমিতেও এ ঘাস জন্মে। জলাবদ্ধ জমি এ ঘাসের জন্য অনুপযোগী।

বিএলআরআই নেপিয়ার-২ (*Pennisetum purpurium*)

বিভিন্ন উৎস্য হতে প্রাপ্ত নেপিয়ার জাত সিলেকশনের মাধ্যমে বিএলআরআই নেপিয়ার-২ উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত জাতটির চাষাবাদ প্রক্রিয়া, সার প্রয়োগ এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্য বিএলআরআই নেপিয়ার-১ এর অনুরূপ। উক্ত জাতটির কান্ড ও পাতা অন্যান্য জাতগুলোর তুলনায় একটু শক্ত, ধারালো এবং পুষ্টিগুণ অন্য দুটি জাতের সমতুল্য।

বিএলআরআই নেপিয়ার-১

বিএলআরআই নেপিয়ার-২

বিএলআরআই নেপিয়ার-৩

বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ (*Pennisetum purpurium*)

বিভিন্ন উৎস্য হতে প্রাপ্ত নেপিয়ার জাতের উন্নত একসেসন সমূহ সিলেকশনের মাধ্যমে বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবিত জাতটির চাষাবাদ প্রক্রিয়া, সার প্রয়োগ এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্য বিএলআরআই নেপিয়ার-১ এবং বিএলআরআই নেপিয়ার-২ এর অনুরূপ। কান্ডের তুলনায় অধিক পাতা উৎপাদন উক্ত জাতটির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর পুষ্টিগুণ অন্য দুটি জাতের সমতুল্য। যে কোন ঘাসের উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলো হচ্ছেঃ ঘাসের বয়স, পরিচর্যা, মাটির গুণাগুন ও জাতের পার্থক্য।

বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ (*Pennisetum purpurium*)

নেপিয়ার জাতের উন্নত একসেসন সিলেকশন করে বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ ঘাসটি তৈরী করা হয়েছে। এটি একটি বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস কাটা যায়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস উত্তম সময়। কার্তিক বা অগ্রহায়ন মাসে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সংগে সংগে কাটিং বিছিয়ে দিলে নেপিয়ার ঘাস সহজেই উৎপন্ন করা যায়। এ সময়ে একই সাথে মিশ্র ফসল হিসেবে মাসকালাই বা খেসারীর বীজ বুনানো যেতে পারে। মাসকালাই বা খেসারী কাটার পর মাটি কোদাল দিয়ে একটু আলগা করে সার ও পানি প্রয়োগ করলে অধিক ফলন আশা করা যায়। বাংলাদেশের প্রায় সব ধরণের মাটি এমনকি পাহাড়ী ঢাল এবং সীমিত লবনাক্ত জমিতেও এ ঘাস জন্মে। জলাবদ্ধ জমি এ ঘাসের জন্য অনুপযোগী।

পাকচং-১ (*Pennisetum purpurium*)

পাকচং ঘাসটি থাইল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে এসেছে যেটি থাইল্যান্ডের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক উৎপাদিত হয়েছে। ঘাসটি সাধারণ নেপিয়ার (Elephant grass) ঘাস (*Pennisetum purpureum*) এবং পার্ল মিলেট বা যব (*Pennisetum*

glaucum) এর ইন্টারস্পেসিফিক সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়েছে। ঘাসটি আমাদের আবহাওয়ায় সহজেই খাপ খায়। ঘাসটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ এটি রোপনের ৬০ দিনের মধ্যেই ৩ মিটারের উপর লম্বা হয়, অধিক উৎপাদনশীল (বছরে হেক্টর প্রতি ৪০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত), ৪৫ দিন পর পর কাটা যায়, যার মধ্যে ক্রুড প্রোটিনের শতকরা হার ১৬-১৮% (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে)। এটি একবার লাগালে বহু বৎসর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

বিএলআরআই নেপিয়ার-৪

পাকচং-১

বিভিন্ন প্রকারের নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি

নেপিয়ারের বিভিন্ন প্রকারের কালটিভারের (উপ-জাত) চাষাবাদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে যেটির উৎপাদন বেশি সেটির লাইন-টু-লাইন স্পেস একটু বেশি দিতে হবে, কারণ সেটি অনেক জায়গা ব্যাপী ছড়িয়ে পরে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার নেপিয়ারের সাধারন চাষাবাদ প্রণালী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হ'ল।

নেপিয়ার রোপনের সময়ঃ বছরের যে কোন সময়ই নেপিয়ার রোপন করা যায়। তবে অঞ্চল ভেদে (বাথান এলাকায়) অক্টোবর-নভেম্বরে এবং খরিপ মৌসুম (অন্যান্য এলাকায়) মার্চ-এপ্রিল (বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত) মাসে রোপন করা যায়।

জমি চাষঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরূপে জমি চাষ দিতে হবে। জমিতে আগাছা থাকলে আগাছা সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিতে হবে। চাষ দেয়ার সময় পরিমাণ মত জৈব সার এবং রাসায়নিক সার দিতে হবে, যাতে সারগুলো মাটির সব জায়গায় ভালভাবে মিশে যায়। চাষ দেয়ার পর মাটি ভালভাবে ঝুরঝুর করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট দূরত্বে আইল তৈরী করে নিতে হবে, যাতে দুই আইলের মাঝে একটু ড্রেনের মত হয়, যেখানে সেচ দিয়ে পানি প্রবেশ অথবা অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে। আইলের মাঝে আগাছা উঠলেও মেশিন দিয়ে অথবা লাঙ্গল দিয়ে আগাছা দূর করা সহজ হবে। তবে আইল তৈরী না করে চাষকৃত সমান জমিতেও নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে নেপিয়ারের কাটিং লাগানো যেতে পারে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতে চাষ ছাড়াই নেপিয়ারের কাটিং রোপন করা যায়।

জমিতে সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুতকালীন প্রতি হেক্টরে জৈব/গোবর সার ২০-২৫ টন, ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। এছাড়াও কাটিং রোপনের ৩০ দিন পর টপ ড্রেসিং হিসাবে ইউরিয়া ৫০ কেজি দিতে হবে এবং প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরও একই মাত্রায় ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ৩-৪ বছর পরে আবার জৈব/গোবর সার, ফসফেট ও পটাস সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটির নমুনা পরীক্ষা করিয়ে নির্ধারিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা ভাল।

আগাছা দমনঃ কাটিং রোপনের ১ মাস পরে এবং প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরে সার প্রয়োগের পূর্বে ভালভাবে আগাছা দমন করতে হবে।

কাটিং প্রয়োজনঃ হেক্টর (হেঃ) প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/মোথা প্রয়োজন।

কাটিং রোপনের দূরত্বঃ এক লাইন থেকে আর এক লাইন ৭০ সে.মি (প্রায় ২ ফুট) ও এক কাটিং থেকে আর এক কাটিং এর দূরত্ব ৩৫ সে.মি. (প্রায় ১ ফুট)। তবে পাকচং এবং নেপিয়ার হাইব্রিড এর ক্ষেত্রে লাইন টু লাইন ৩ ফুট এবং কাটিং টু কাটিং দূরত্ব ১.৫ ফুট (কিংবা ২ ফুট বাই ২ ফুট) দিলে গাছ ভালভাবে ছড়াতে পারে। কাটিং ৪৫ ডিগ্রী কোনে এবং কুঁশিকে উর্দ্ধমুখীভাবে রোপন করতে হবে।

সেচঃ খরা মৌসুমে মাটির আর্দ্রতা বুঝে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হয়।

ফসল (ঘাস) কর্তনের সময়ঃ অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কালঃ ৩৫-৪৫ দিন, শীতকালঃ ৬০-৭০ দিন (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)।

বছরে ফসল কর্তনের সংখ্যাঃ অঞ্চলভেদে ১ম বছরঃ ৪-৫ বার। পরবর্তী বছর গুলোতে ৬-৭ বার

বছরে মোট উৎপাদনঃ ১৫০-২৫০ টন/হেঃ

নেপিয়ারের বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের উৎপাদন ও পুষ্টি গুণাগুণ

বিভিন্ন ঘাসের বয়স, পরিচর্যা, মাটির গুণাগুন ও জাতের পার্থক্যের উপর এগুলোর উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান নির্ভর করে। নীচে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত নেপিয়ার ঘাসের বিভিন্ন জাতের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান ৩.১নং টেবিলে উপস্থাপন করা হল।

টেবিল-৩.১ঃ বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত বিভিন্ন জাতের নেপিয়ার ঘাসের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান (৫০ দিন বয়সে)

বৈশিষ্ট্যাবলী		নেপিয়ার-১	নেপিয়ার-২	নেপিয়ার-৩	নেপিয়ার-৪	পাকচং
ক)	**উৎপাদন ও রাসায়নিক গঠন**					
	ঘাস উৎপাদন, টন (প্রতি হেক্টর প্রতি বছরে)	১২০-১৫০	১২০-১৬০	১২০-১৬০	২২০-২৫০	২৮০-২৫০
	ঘাসে জলীয়াংশের পরিমাণ (কিলো/১০০ কিলো)	৭৫-৮০	৭৫-৮০	৭৫-৮০	৭৫-৮০	৮০-৮২
	আমিষ (কিলো/১০০ কিলো)	১.১৫-১.২০	১.২০-১.২৫	১.৮০-২.০	১.১৫-১.২০	০.৯০-১.০
	আঁশের পরিমাণ (এডিএফ, কিলো/১০০ কিলো)	১০.২-১০.৫	৯.৫-১০.৫	৯.৫-১০.৫	১০.২-১০.৫	-
খ)	**খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাচ্যতা**					
	প্রতি ১০০ কিলো গরুর ওজনের জন্য দৈনিক গ্রহণ (কিলো)	৮.০-৮.৫০	৬.০-৭.০	৭.০-৮.০	৮.০-৮.৫০	-
	ঘাসের পাচ্যতা (কিলো/১০০ কিলো)	৪৯.০-৫০.০	৩৮.০-৪০.০	৪৫.০-৫০.০	৪৯.০-৫০.০	-
	পাকস্থলীতে পাচ্যতা (কিলো/১০০ কিলো)	৩৫.০-৪০.০	২০.০-২৫.০	৩০.০-৩২.০	৩৫.০-৪০.০	-
গ)	**উৎপাদন দক্ষতা (মাংস ও দুধ উৎপাদন)**					
	দানাদার না খাইয়ে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন/ষাঁড়)	২৯৬.০	১৪০.০	১৭২.০	২৯৬.০	-
	দানাদার সহ দেশী গরুতে দুধ উৎপাদন (কেজি)	৩.৫০-৪.০০	২.৫০-৩.০০	৩.৫০-৪.০০	৩.৫০-৪.০০	-

এন্ড্রোপোগন ঘাস (*Andropogon gyanus*)

এটি বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস। জলাবদ্ধ ও লবনাক্ত অঞ্চল ছাড়া সব ধরনের মাটিতেই জন্মে।

চাষ পদ্ধতিঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে জমি চাষ দিতে হবে। বন্যা পরবর্তীতে কাদামাটিতে চাষ ছাড়াই রোপন করা যায়। হেঃ প্রতি ২৮-৩০ হাজার মোথা প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দূরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে.মি এবং ৩৫ সে.মি.।

সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুত কালীন: হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। প্রতি কাটিং পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া।

সেচঃ খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর।

ঘাস কাটার সময়ঃ অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কালঃ ৩৫-৫০ দিন পর পর, শীতকালঃ ৬০-৭০ দিন পর পর (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)।

কাটিং সংখ্যা/বৎসরঃ অঞ্চলভেদে ১ম বছরঃ ৪-৫ বার, পরবর্তী বছর গুলোতে ৫-৬ বার।

ঘাস উৎপাদনঃ ১০০-১৩০ টন/হেঃ (বার্ষিক)

রোজী ঘাস (*Brachiaria ruziziensis*)

রোজী একটি বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস। জলাবদ্ধ ও পাহাড়ী ঢাল ছাড়া সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। এ ঘাস মধ্যম মানের লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে। সাইলেজ বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) করে সংরক্ষণ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে জমি চাষ দিতে হবে। হেঃ প্রতি ৩৫-৪০ হাজার মোথা প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দূরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে.মি এবং ৩৫ সে.মি.।

সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুত কালীন হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। প্রতি কটিং পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া।

সেচঃ খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর।

ঘাস কাটার সময়ঃ অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কালঃ ৪০-৫০ দিন পর পর, শীতকালঃ ৬০-৮০ দিন পর পর (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)।

কাটিং সংখ্যা/বৎসরঃ ১ম বছরঃ ৭-৮ বার পরবর্তী বছর গুলোতে ৮-১০ বার।

ঘাস উৎপাদনঃ ৭০-৯০ টন/হেঃ (বার্ষিক)

পাসপালাম (*Paspalum plicatulum*)

পাসপালাম একটি বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস। জলাবদ্ধ ও পাহাড়ী ঢাল ছাড়া সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। সাইলেজ বা 'হে' (শুকিয়ে) সংরক্ষণ করা যায়। পাসপালাম ঘাসের চাষাবাদ প্রক্রিয়া, সার প্রয়োগ এবং উৎপাদন বৈশিষ্ট্য রোজী ঘাসের অনুরূপ।

গিনি ঘাস (*Penicum maximum*)

গিনি ঘাস উঁচু ও ঢালু জমি ছাড়া অন্য কোন স্যাঁতসেতে, জলাবদ্ধ বা নীচু জমিতে জন্মায় না। গিনি ঘাস ফলের বাগান বা অন্যান্য গাছের নীচে, পানি সেচের নালার পার্শ্বে, ছায়ায় ভাল জন্মে। গিনি ঘাস একবার লাগালে ৩-৫ বৎসর পর্যন্ত ভাল ফলন পাওয়া যায়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন হতে আষাঢ় মাস।

চাষ পদ্ধতিঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরূপে জমি চাষ দিতে হবে। হেঃ প্রতি ২০-৩০ হাজার মোথা/কাটিং প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দূরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে.মি এবং ৩৫ সে.মি.।

সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুত কালীন হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। প্রতি কাটিং পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া।

সেচঃ খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর।

ঘাস কাটার সময়ঃ অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কালঃ ৪০-৫০ দিন পর পর, শীতকালঃ ৬০-৮০ দিন পর পর (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)।

কাটিং সংখ্যা/বৎসরঃ অঞ্চল ভেদে বৎসরে ৩-৬ বার।

ঘাস উৎপাদনঃ ১০০-১২৫ টন/হেঃ (বার্ষিক)

স্প্লেনডিডা (*Setaria splendida*)

স্প্লেনডিডা একটি বহুবর্ষী ঘাস। একবার লাগালে এই ঘাস হতে ৫/৭ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপাদন করা যায়। কাটার পর পুনরায় কুশি গজায় বিধায়, এ ঘাস রোপণ করে সারা বছরই একটি খামারের সবুজ ঘাসের যোগান দেয়া সম্ভব। এ ঘাসের পাতা চওড়া ও কান্ড নরম। কান্ড নেপিয়ার ঘাসের মতই মোটা। তবে, কান্ডে গিঁটের সংখ্যা কম। এ ঘাসে কান্ডের তুলনায় পাতা বেশী। গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষকে সবুজ অবস্থায় জমি হতে ঘাস কেটে সরাসরি স্প্লেনডিডা ঘাস খাওয়ানো যায়। এ ঘাস সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করেও সারা বছর গো-খাদ্য হিসেবে সরবরাহ করা যায়। ভাল সংরক্ষণের জন্য প্রতি ১০০ কেজি ঘাসে ২-৩ কেজি চিটাগুড় দেয়া যেতে পারে। তবে, ঘাস ছোট ছোট করে টুকরা করে সংরক্ষণ করলে চিটাগুড়ের প্রয়োজন নেই। গবাদিপশুকে এ ঘাস যথেচ্ছা সরবরাহ করা যেতে পারে। একটি পূর্ণবয়স্ক গাভী ও ষাঁড় এই ঘাস প্রতিদিন ৩০-৪০ কেজি পর্যন্ত খেতে পারে। ছাগল-ভেড়াকে এ ঘাস সরবরাহ করা যেতে পারে দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি হারে।

স্প্লেনডিডার চাষাবাদ প্রণালী

১। রোপনের সময়	ঃ	যে কোন সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে।
২। মাটির ধরন	ঃ	জলাবদ্ধ, লবনাক্ত ও পাহাড়ী ঢাল ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরনের জায়গায় এ ঘাস জন্মে।
৩। জমি তৈরী	ঃ	উত্তম ভাবে চাষ করে জমি তৈরী করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাঁদামাটিতে মোথা লাগানো যেতে পারে।
৪। কাটিং এর সংখ্যা	ঃ	প্রতি হেঃ জমির জন্য ৩৫-৪০ মোথা/কাটিং
৫। কাটিং লাগানোর দুরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন: ৭০ সে.মি. ও কাটিং থেকে কাটিং ৩৫ সে.মি.
৬। সার প্রয়োগ	ঃ	জমি তৈরীর সময়: ইউরিয়া ঃ টিএসপিঃ এমপি ৫০ঃ৭০ঃ ৩০ কেজি প্রতি হেঃ
	ঃ	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর: ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হেঃ
	ঃ	প্রতি কাটিং এর পর পর: ইউরিয়া ৫০-৭৫ কেজি প্রতি হেঃ
৭। সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর
৮। ঘাস কাটার সময়	ঃ	২৫-৩০ দিন ঃ গ্রীষ্মকাল
		৩০-৪০ দিন ঃ শীতকাল (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯। বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৭-৯ বার ১ম বছর, ৯-১১ বার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর
১০। বছরে ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১০০-১৩০ টন
১১। ১ কেজি ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	শুষ্ক পদার্থ-৩৩৫ গ্রাম, জৈব পদার্থ-৩১৭ গ্রাম, প্রোটিন-২১ গ্রাম, ফাইবার-১৮৩ গ্রাম, পরিপাচ্যতা-৬০% ও বিপাকীয় শক্তি ৩.২০ মেগাজুল।
১২। সংরক্ষন	ঃ	সাইলেজ তৈরী বা হে (শুকিয়ে সংরক্ষণ) তৈরী।

৩.২ নন-লিগুমিনাস বর্ষজীবি ঘাস

ভুট্টার পরিচিতি

ভুট্টা একটি বর্ষজীবি অর্থকরী শস্য। ভুট্টার কচি সবুজ ঘাস গবাদিপশুর জন্য যেমন পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য, ঠিক তেমনি এর দানা মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু খাবার তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। ভুট্টার জাতসমূহের মধ্যে বর্ণালী, শুভ্রা, খইভুট্টা, মোহর, বারি ভুট্টা ৫, বারি ভুট্টা ৬, প্যাসিফিক ১১, বারি হাইব্রিড ভুট্টা এবং হাইব্রিড ভুট্টা, কোয়ালিটি প্রোটিন মেইজ অন্যতম। অনেক হাইব্রিড ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করার পরও এর গাছ সবুজ থাকে। এগুলো ভাল গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর দানা হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে ও ঢাকা বিভাগে ব্যক্তি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে ভুট্টা চাষ হয়। মোট ভুট্টা চাষের জমির প্রায় ৮০ শতাংশই এসব অঞ্চলে অবস্থিত।

ভুট্টা চাষের উপযুক্ত মাটি, সময় ও পরিবেশ

বাংলাদেশে রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) ও খরিপ (মার্চ-অক্টোবর) উভয় মৌসুমেই ভুট্টা চাষ করা হয়। পানি নিষ্কাশনের সুযোগসহ দোআঁশ অথবা এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ভুট্টা উৎপাদন করা যায়। পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা হলে বেলে দোআঁশ মাটিতেও ভুট্টা উৎপাদন সম্ভব। অধিক বৃষ্টি এবং অধিক শীত ভুট্টা সহ্য করতে পারে না।

জমি চাষ

বীজ বপণের পূর্বে উত্তমরূপে চাষের পর জমি তৈরী করে নিতে হয়। তারপর ৩-৪ বার মই দিয়ে মাটি গুড়া করে ছোট করতে হবে। পঁচা গোবর, খামারজাত বা গৃহস্থালী আবর্জনা পচা সার প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ মেঃ টন (৫৫০-৬৭০ মণ) জমি চাষের সময় ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গোবর সারের অতিরিক্ত হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি, পটাশ ৩০ কেজি জমি তৈরীর সময় দিতে হবে। গোবর সার না দিলে হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ২০০-২৫০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বপণের ৩০ দিন পর মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে হেক্টর প্রতি ৩৫ থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ভুট্টার বীজ বপন, সেচ-নিষ্কাশন, নীড়ানি ও কর্তন

ভুট্টার বীজ ছিটিয়ে বপণ করার চেয়ে লাইন বা সারি করে বপণ করা ভাল। লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৩০ সেঃমিঃ, বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৫ সেঃ মিঃ ও ৩-৫ সেঃমিঃ গভীরে বীজ বপণ করতে হয়। ঘাস উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি ২৪-২৮ কেজি এবং দানা উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি ১৮-২০ কেজি ভুট্টা বীজের দরকার। জমি তৈরীর পর যদি দেখা যায় মাটি শুকিয়ে গেছে তবে বীজ বপণের আগে পরিমাণমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। খরা মৌসুমে ভুট্টার বীজ বপণ করলে প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর প্রায় ৩-৪ বার পানি সেচের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত পানি সেচ ভুট্টা গাছের জন্য ক্ষতিকর। ভুট্টা গাছ ১৫-২০ সেঃমিঃ লম্বা হলে নিড়ানী বা কোদাল দ্বারা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সবুজ ঘাস হিসেবে ভুট্টা বপণের ৮-৯ সপ্তাহ পর গাছের রং সবুজ থাকা অবস্থায় অর্থাৎ ফুল ও মোচা হওয়ার পূর্বে কাটতে হয়। তবে, বর্তমানে গো-খাদ্যের জন্য অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ভুট্টা ঘাস পাওয়ার জন্য ভুট্টার দানা হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর মোচাসহ গাছ কেটে টুকরা টুকরা করে সংরক্ষণ করা হয়।

ভুট্টার ফলন ও পুষ্টিমান

সবুজ ঘাস হিসেবে হেক্টর প্রতি ৬০-৬৫ মেঃ টন ঘাস উৎপাদিত হয় এবং হাইব্রিড ভুট্টা হতে রবি ও খরিপ মৌসুমে হেক্টর প্রতি দানা উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৬-১০ মেঃ টন ও ৪-৫ মেঃ টন। তাছাড়া প্রতি ঋতুতে হেক্টর প্রতি ভুট্টার খড় উৎপন্ন হয় প্রায় ২৫-৫০ মেঃ টন।

ভুট্টার সাথে ইন্টারক্রপ (সমন্বিত চাষ) ফসল হিসেবে আলফালফা, কাউপি, মাসকালাই, খেসারী, ধৈঞ্চা ইত্যাদি জাতীয় লিগুমিনাস ফডার চাষ করা যায়। ভুট্টার পুষ্টিমান নিচের ৩.২নং সারণীতে দেয়া হল।

সারণী ৩.২ঃ ভুট্টার বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান (%)

ভুট্টার অবস্থা	শুষ্ক পদার্থ	জৈব পদার্থ	আমিষ	খনিজ	এডিএফ	আঁশ	ইথার এক্সট্রাক্ট
দানা	৯০	৯৮	১০	২	-	৩	৪
মোচাসহ ঘাস	৩০	৯৩	৬	৭	৪৪	-	-
ভুট্টা খড়/স্টোভার	৩৫	৯৪	৮	৬	৪৮	-	-

ভুট্টার ব্যবহার

ভুট্টার কোন কিছুই ফেলা যায় না। ভুট্টা ঘাস, দানা বা ভুট্টা এসবই গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য। ঘাস হিসেবে চাষ করলে ভুট্টার মোচা হলুদ বর্ণের পরিপক্কতা লাভ করলে সেই অবস্থায় গাছসহ কেটে ২-৩ ইঞ্চি আকারে টুকরো টুকরো করে সাইলেজ তৈরী করে সংরক্ষণ করা যায়। এতে ঘাসে আমিষ ও শক্তির মাত্রা বেড়ে যায়। অন্যদিকে, ভুট্টার দানা পরিপক্ক হলে মোচা সংগ্রহ করার পর পরিত্যক্ত ভুট্টার খড়ও সাইলেজ করে সংরক্ষণ করে উৎকৃষ্ট মানের পশু খাদ্য তৈরী করা যায়। উল্লেখ্য হাইব্রিড ভুট্টার খড়, ভুট্টার দানা সংগ্রহ করার পরও সবুজ ও সতেজ থাকে। এই খড়ের পুষ্টিমান অনেক ক্ষেত্রেই সবুজ ঘাসের সমতুল্য। ভুট্টার খড় হতে বছরে দু'বার সাইলেজ করা যায় এবং সারা বছর পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ভুট্টার দানা গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের জন্য একটি উৎকৃষ্টমানের শক্তির উৎস।

গবাদিপশুকে যথেচ্ছা পরিমাণ মোচাসহ তৈরীকৃত ভুট্টার সাইলেজ বা ভুট্টা খড়ের সাইলেজ খাওয়ানো যায়। একটি পূর্ণবয়স্ক গাভী বা মোটাতাজাকরণের ষাঁড় দৈনিক মোট ২৫-৩৫ কেজি মোচাসহ তৈরীকৃত ভুট্টা গাছের সাইলেজ খেয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক ছাগল-ভেড়াকে দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি হারে এই সাইলেজ সরবরাহ করা যেতে পারে। ভুট্টা খড়ের সাইলেজ একটি পূর্ণবয়স্ক গাভী ১৮-২৫ কেজি পরিমাণ খেতে পারে। ভুট্টার দানা গাভী, মোটাতাজাকরণের ষাঁড়, ছাগল-ভেড়ার দানাদার খাদ্যে শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। সারণী ৩.৩ এ ভুট্টার চাষাবাদ প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল।

সারণী ৩.৩ঃ সংক্ষেপে ভুট্টার বপন পদ্ধতি

বপন পদ্ধতি	প্রায়োগিক দিক		
বীজের হার	২৫-৩০ কেজি/হেক্টর		
বপনের সময়	রবি মৌসুম (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ
	খরিপ মৌসুম (মার্চ-অক্টোবর)		মার্চের ১ম সপ্তাহ
বীজ বপন	লাইনে বপন। লাইন হতে লাইনের দূরত্ব ৭৫ সে.মি. এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব ২৫ সে.মি. এভাবে লাগাতে হবে। বীজ মাটির ২.৫ সে.মি. গভীরে পুঁততে হবে।		
সার প্রয়োগ (কেজি/হেক্টর)	গোবর: ৫ টন/হেক্টর, ইউরিয়া: ২০০, টিএসপি: ১৫০, এমপি: ১৫০, জিঙ্ক: ১০		
সার প্রয়োগের (কেজি/হেক্টর) সময়	ইউরিয়া	জমি তৈরীর সময়	: ৫০
		১ম টপ ড্রেসিং	: ১০০ (চারা গজানোর ৩০ দিন পর)
		২য় টপ ড্রেসিং	: ৫০ (চারা গজানোর ৬০ দিন পর)
	টিএসপি	জমি তৈরীর সময়	: ৫০
		১ম টপ ড্রেসিং	: ১০০ (চারা গজানোর ৩০ দিন পর)
	এমপি	জমি তৈরীর সময়	: ১৫০
	জিঙ্ক	জমি তৈরীর সময়	: ১০
সেচ প্রয়োগ	১ম সেচ: চারা গজানোর ৩০ দিন পর		
	২য় সেচ: চারা গজানোর ৬০ দিন পর		
	৩য় সেচ: চারা গজানোর ৯০ দিন পর		
নিড়ানী	১ম সেচের পর		
মালচিং	নিড়ানীর পর		
রোগ বালাই	পাতা সাদা হয়ে যাওয়া বা কুঁকড়ে যাওয়া, মূল পঁচে যাওয়া ইত্যাদি হলে আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলতে হবে।		
কর্তন	দানা পুরোপুরি পরিপক্ক হলে।		
	রবি মৌসুম (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		: বপনের ১৪০-১৫০ দিন পর।
	খরিপ মৌসুম (মার্চ-অক্টোবর)		: বপনের ৯৫-১০২ দিন পর।

জাম্বু ঘাস (*Hybrid sorghum*)

জাম্বু এক-বর্ষী বা বহুবর্ষী ঘাস হিসেবে পরিচিত। একবার লাগালে ২-৩ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাস। প্রায় সব ধরণের মাটিতেই জন্মে। তবে বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। এ ঘাস সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়।

চাষ পদ্ধতি: প্রচলিত পদ্ধতিতে জমি চাষ দিতে হবে। হেঃ প্রতি ৭ কেজি বীজ অথবা ৩৫-৪০ হাজার মোথা/কাটিং প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুত কালীন হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। এক মাস পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। প্রতি কাটিং এর পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া।

সেচ: খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর।

ঘাস কাটার সময়: গ্রীষ্ম কালঃ ৩০-৪৫ দিন পর, শীতকালঃ ৪০-৫০ দিন।

কাটিং সংখ্যা/বৎসর: ১ম বছরঃ ৪-৫, পরবর্তী বছরে ৭-৮ বার।

ঘাস উৎপাদন: ১০০-১৫০ টন/হেঃ

ওট ঘাস

ওট (*Avena sativo*) একটি বর্ষজীবি শস্য জাতীয় ঘাস যা প্রায় সব ধরনের জমিতে জন্মায়। তবে বেলে দো-আঁশ মাটিতে এটি ভাল হয়। ওট সাইলেজ বা হে করেও সংরক্ষণ করা যায়।

চাষ পদ্ধতিঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে উত্তমরূপে জমি চাষ দিতে হবে। জমিতে আগাছা থাকলে আগাছা সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিতে হবে। চাষ দেয়ার সময় পরিমান মত সার দিতে হবে যাতে সার মাটির সব জায়গায় ভালভাবে মিশে যায়। চাষ দেয়ার পর মাটি ভালভাবে ঝুরঝুর করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। এরপর ওট যদি সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয় তবে ১০-১২ ইঞ্চ দূরত্ব পর পর কেইল তৈরী করে নিতে হবে। নতুবা ছিটিয়ে দিলে আর কিছু করার প্রয়োজন নেই।

সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুতকালীন হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ প্রদানের হারঃ হেক্টর প্রতি বীজ প্রদানের হার ৮০-১০০ কেজি। বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায়।

সেচঃ খরা মৌসুমে মাটির আর্দ্রতার অবস্থা বুঝে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিতে হয়।

ঘাস কাটার সময়ঃ সেচ সুবিধা সাপেক্ষে ৬০-৮০ দিন পর ঘাস কাটা যায়।

কাটিং সংখ্যা/বছরঃ বছরে ২-৩ বার কর্তন করা যাবে।

ঘাস উৎপাদন (টন/হেক্টর)ঃ ৩০-৪০ টন।

ওট ঘাসের পুষ্টিমানঃ ওট ঘাসের পুষ্টি উপাদান নিম্নরুপঃ

শুষ্ক পদার্থঃ ৩২০ গ্রাম (প্রতি কেজিতে)
জৈব পদার্থঃ ৮০ গ্রাম (প্রতি কেজিতে)
ক্রুড প্রোটিনঃ ১০ গ্রাম (প্রতি কেজিতে)
বিপাকীয় শক্তিঃ ৩.২ মেগাজুল (প্রতি কেজি শুষ্ক পদার্থে)

৩.৩ লিগুমিনাস (ডাল জাতীয়) মৌগুমী ঘাস

খেসারী

খেসারী একটি বর্ষজীবি ডাল জাতীয় ঘাস। গাছ সাধারণত সবুজ এবং ফুলের রং নীল। প্রচুর শাখা-প্রশাখা গজায়। খেসারী বেশ কষ্টসহিষ্ণু ঘাস। এ ঘাস কর্দমাক্ততা, শুষ্কতা, এমনকি লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। শীতকালীন ফসল বলে কাঁচা ঘাস হিসেবে বছরের অন্যান্য ঋতুতে পাওয়া যায় না। ডাল জাতীয় ঘাস হওয়ায় এর শিকড় জীবাণুর সাহায্যে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে থাকে। বারি খেসারী-১ ও বারি খেসারী-২ নামে খেসারীর দুইটি জাত রয়েছে। খেসারী ঘাস, ডাল ও ডালের খোসা পশুপাখী ও মাছের প্রিয় খাদ্য। বর্তমানে খেসারী চাষের অধীনে মোট জমির পরিমাণ প্রায় ২.৩ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার মেঃ টন।

খেসারী চাষের উপযুক্ত মাটি, সময় ও পরিবেশ

দো-আঁশ এবং এটেল দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। দেশের নদী অববাহিকা অঞ্চলে বিশেষ করে যমুনার চরাঞ্চলের দুগ্ধ উৎপাদনকারী বাথান (গবাদিপশুর চারণভূমি) অঞ্চলে বিরাট এলাকা জুড়ে এর চাষ করা হয়। প্রধানত বোনা আমন ধান কাটার পূর্বে রিলে ফসল হিসেবেও খেসারী আবাদ করা হয়। সে জন্য জমি চাষের প্রয়োজন হয় না। একক ফসল হিসেবে আবাদের ক্ষেত্রে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিতে হয়। কখনও জমি চাষ করে সরিষা, বার্লি, ছোলা, মশুর কালাই এমনকি নেপিয়ার এর সাথে মিশ্রিত ফসল হিসেবে জন্মানো যায়। এছাড়া, পতিত জমি, চর বা হাওড় এলাকার পানি চলে যাওয়ার পর বিনা চাষে বা চাষ দিয়ে বীজ ছিটিয়ে বপণ করা যায়। রিলে ফসল হিসেবে চাষ করলে আমন ধান কাটার প্রায় এক মাস পূর্বে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা অবস্থায় কার্তিক মাস থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর) পর্যন্ত বীজ ছিটিয়ে বপণ করতে হবে। একক ফসলের জন্য মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ (নভেম্বর) মাসে বপণ করা উত্তম।

বীজ, সার, বপন প্রণালী, ফলন ও পুষ্টিমান

বীজ ছিটিয়ে বপণ করা উত্তম। তবে, সারিতে বপণের ক্ষেত্রে সারির দূরত্ব ৫০ সেঃমিঃ রাখতে হবে। প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ কেজি বীজ লাগে। তবে, রিলে ফসলের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ কিছু বেশী দিতে হয়। খেসারীর রিলে ফসলের ক্ষেত্রে সারের প্রয়োজন হয় না। একক ফসলের জন্য অনুর্বর জমিতে হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৪০-৪৫ কেজি, টিএসপি ৮০-৮৫ কেজি এবং এমপি সার ৩০-৪০ কেজি ব্যবহার করতে হবে। সমুদয় সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

হেক্টর প্রতি ১৫-২০ মেঃ টন কাঁচা ঘাস এবং ১.২-১.৫ মেঃ টন দানা পাওয়া যায়। খেসারীর ডাল ও শাকে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রয়েছে। তবে, খেসারী কলাই বেশী দিন ব্যবহার করলে মানুষের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির জন্য খেসারী উপকারী ঘাস। খেসারী দানা, ভূষি ও সবুজ ঘাসের পুষ্টিমান নিচের ৩.৪ নং সারণীতে দেয়া হল।

সারণী ৩.৪ঃ খেসারীর বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান (%)

খাদ্যের নাম	শুষ্ক পদার্থ	জৈব পদার্থ	আমিষ	আঁশ	খনিজ	চর্বি
দানা	৮৯	৯৪	২৩	৮	৫	১
ভূষি	৮৮	৯২	১২	৩৮	৮	১
কাঁচা ঘাস	১৮	৯১	১৯	১৬	৯	২
শুকনো ঘাস	৮৮	৮৯	১৮	৩১	১১	৩

খেসারীর ব্যবহার

খেসারী ফসল পাকতে প্রায় ১২৫-১৩০ দিন সময় লাগে। বীজ বপণের ৬০-৮০ দিনের মধ্যে ঘাসে ফুল বা ছড়া ধরা শুরু হয় এবং এ অবস্থায় কাঁচা ঘাস হিসেবে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়। মাঠে চড়িয়ে দুধালো গাভী বা অন্যান্য গবাদিপশুকেও খাওয়ানো যায়। খেসারী ঘাস শুকিয়ে সংরক্ষণ করেও খাওয়ানো যায়। খেসারীর ডাল বা ভূষি গবাদিপশুর জন্য পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য। চর, হাওড় ও বাথান এলাকায় গরু চড়িয়ে বা মাঠে বেঁধে এ ঘাস সরাসরি খাওয়ানো যায়। ডাল সংগ্রহ করার পর ডালের খড়ও গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করা যায়। খেসারী দানা ও ভূষি আমিষের উৎস হিসেবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির জন্য ব্যবহার করা হয়।

মাসকালাই/মাটিকালাই

বাংলাদেশে প্রচলিত ডাল ফসলের মধ্যে মাসকালাইয়ের স্থান চতুর্থ। এটি একটি বর্ষজীবি ঘাস। গাছটি লম্বায় ৫০ সেঃমিঃ, সারা গা রোমশ এবং ঘন পত্রাকারে সন্নিবেশিত থাকে। বীজের রং কালো। দেশে মোট উৎপাদিত ডালের ৯-১১% আসে মাসকালাই থেকে। মাসকালাইয়ের ৩টি উন্নত জাত হল, বারি মাস ১ (পান্থ), বারি মাস-২ (শরৎ) এবং বারি মাস-৩ (হেমন্ত)।

মাসকালাই চাষের উপযুক্ত মাটি, সময় ও পরিবেশ

মাঝারি উঁচু ও নিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি মাসকলাই উৎপাদনের জন্য উপযোগী। জমিতে ২-৩ টি আড়াআড়ি চাষ ও প্রয়োজনীয় মই দিয়ে মাটি ভালভাবে তৈরী করতে হয়। বীজ ছিটিয়ে বা সারি করে বপণ করা যায়। সারিতে বপণের ক্ষেত্রে সারির দূরত্ব ৩০ সেঃমিঃ রাখতে হবে। খরিপ মৌসুমে ছিটিয়ে বোনা যায়। প্রতি হেক্টরে ৩৫-৪০ কেজি বীজের প্রয়োজন। তবে, ছিটিয়ে বপণের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ কিছু বেশী দিতে হয়। এলাকাভেদে বপণ সময়ের তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন

এলাকায় মধ্য থেকে শেষ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারী শেষ হতে মধ্য মার্চ) এবং অন্যান্য এলাকায় ভাদ্র (আগষ্টের) পর্যন্ত বপণ করা যায়। যমুনা অববাহিকার দুগ্ধ উৎপাদনকারী অঞ্চলে জমি হতে বন্যার পানি নামার সাথে সাথে (মধ্য সেপ্টেম্বর হতে অক্টোবর) গো-খাদ্যের জন্য বিনা চাষে ব্যাপকভাবে এর আবাদ করা হয়।

বীজ, সার, বপন প্রণালী, ফলন ও পুষ্টিমান

অনুর্বর জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৪০-৫০ কেজি, টিএসপি ৮৫-৯৫ কেজি এবং এমপি সার ৩০-৪০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বপণের ২০ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের ফলে যাতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হতে পারে সে জন্য অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বপণের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং দানার ফলন হেক্টর প্রতি ১.৪-১.৫ মেঃ টন। ঘাসের জন্য চাষ করা হলে হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ মেঃ টন। দেশে মাসকালাইয়ের মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৬৫ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৫০ হাজার মেঃ টন। মাসকালাই দানা, খড় ও সবুজ ঘাসের পুষ্টিমান নিচের ৩.৫ নং সারণীতে দেয়া হল-

সারণী ৩.৫ঃ মাসকালাই এর বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান

খাদ্যের নাম	শুষ্ক পদার্থ %	জৈব পদার্থ %	আমিষ %	আঁশ %	খনিজ %	চর্বি %
দানা	৮৮	৯৪	২৫	৬	৬	১
খড়	৮৭	৮৮	৯	৩০	১২	৩
সবুজ ঘাস	২০	৮৯	১৮	২১	১১	৪

মাসকালাই এর ব্যবহার

খামারীগণ সাধারণত গরু, ছাগলকে মাঠে চরিয়ে সবুজ মাসকালাই ঘাস খাওয়ান। ঘাস শুকিয়ে বা সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করেও খাওয়ানো যায়।

কাউপি

কাউপি এক ধরনের ডাল জাতীয় বর্ষজীবি ঘাস বা শস্য। গাছটি উচ্চতায় ৪০-৪৫ সেঃমিঃ হয়। গাছের ডগা ও পাতা হালকা সবুজ। গাছ সাধারণত খাড়া থাকে। তবে, অত্যধিক খাদ্য এবং পানি পেলে লতানো হয়ে যায়। কাউপি খরা ও লবণাক্ত সহিষ্ণু। সবুজ ফল তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। কাউপি শবজি বা ঘাস হিসেবে পৃথিবীর অনেক দেশেই চাষাবাদ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ভোলা, ফেনী ও চাঁদপুর অঞ্চলের মানুষের নিকট কাউপি বা ফেলন ডাল অত্যন্ত সুপরিচিত। সবুজ ফল তরকারী হিসেবে খাওয়া যায়।

চাষ পদ্ধতি, উৎপাদন ও পুষ্টি

বেলে দো-আঁশ থেকে এটেল দো-আঁশ মাটিতে কাউপি চাষ করা যায়। জমি উঁচু ও মাঝারি উঁচু নিষ্কাশনযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জমি ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করতে হয়। বীজ প্রধানত ছিটিয়ে বপণ করা হয়। সারিতে বপণ করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০-৪০ সেঃমিঃ এবং গাছ থেকে গাছ ১০ সেঃমিঃ রাখতে হবে। সাথী ফসল হিসেবে ভুট্টার সাথে এর চাষ করা যায়। সাধারণত অগ্রহায়ণ (মধ্য-নভেম্বর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর) মাস বীজ বপণের উত্তম সময়। হেক্টর প্রতি ৪০-৫০ কেজি বীজের প্রয়োজন। জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ২০-৩০ কেজি, টিএসপি ৪০-৪৫ কেজি এবং এমপি সার ২০-৩০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে, গাছে ফল আসার সময় একটি সেচ দিতে পারলে ভাল ফলন হয়। মধ্য চৈত্র থেকে শেষ সপ্তাহ (শেষ মার্চ-প্রথম এপ্রিল) পর্যন্ত ফসল সংগ্রহের উত্তম সময়। অর্থাৎ বপণের ১২৫-১৩৫ দিনের মধ্যে ফসল কাটা যায় এবং দানার ফলন হেক্টর প্রতি ১.১-১.৪ মেঃ টন। বাংলাদেশের প্রায় ১৯ হাজার হেক্টর জমিতে এর চাষ হয় এবং এ থেকে উৎপাদন হয় প্রায় ১৩ হাজার মেঃ টন। কাউপির দানা ও সবুজ ঘাসের পুষ্টিমান নিচের ৩.৬ নং সারণীতে দেয়া হল-

সারণী ৩.৬ঃ কাউপির বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান

	শুষ্ক পদার্থ %	খনিজ পদার্থ %	আমিষ %	আঁশ %	চর্বি %
দানা	৮৮	৪	২৭	৫	২
সবুজ ঘাস	১৫	১৪	১৮	২৬	৩

কাউপি এর ব্যবহার

মাঠ থেকে কেটে খড় বা অন্যান্য ঘাসের সাথে সমান হারে মিশিয়ে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। ভুট্টার সাথে মিশ্র ফসল হিসাবে কাউপি উৎপাদন করে এক সংগে সাইলেজ হিসাবে সংরক্ষণ করে খাওয়ানো যায়। এই ঘাসকে রোদে শুকিয়েও সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। বীজকে দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়।

আলফালফা (*Medicago sativa*)

শুটি জাতীয় তথা লিগুমিনাস গবাদি পশু খাদ্যের মধ্যে আলফালফা (*Medicago sativa*) অন্যতম। আলফালফার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি বহুবর্ষজীবি ফডার, অর্থাৎ এটি একবার চাষ করলে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ফলন সংগ্রহ করা যায়। এটি একবার চাষ করলে বৎসরে ৮-১০ বার ফলন সংগ্রহ করা যায়। এটির আরেকটি বড় গুন হচ্ছে এর মধ্যে প্রোটিনের পরিমান অনেক বেশি (প্রায় ২৫-৩০% ক্রুড প্রোটিন)। শুকনো আবহাওয়ায় এর চাষ ভাল হয়। আলফাআলফা সবুজ ঘাস হিসাবে অথবা শুকিয়ে হে তৈরী করেও পশুকে খাওয়ানো যায়।

আলফালফা চাষের উপযোগী আবহাওয়া

গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় আলফালফা ভাল উৎপাদন হয়। শুষ্ক অঞ্চলে আলফালফা বেশি তাপ বা শীত সহ্য করতে পারে। কিন্তু আর্দ্র অঞ্চলে বেশি তাপ সহ্য করতে পারেনা। আলফালফা অনাবৃষ্টি সহ্য করতে পারে। সেজন্য উষ্ণ ও অল্প বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে এটি ভাল জন্মায়।

আলফালফা চাষের উপযোগী মাটি

আলফালফা প্রায় সব রকম মাটিতেই চাষ করা যায়, তবে উর্বর দোঁ-আশ মাটি আলফালফা চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। মাটিতে অধিক অম্ল কিংবা অধিক ক্ষার থাকলে সেই মাটিতে আলফালফা ভাল হয় না।

আলফালফা চাষের জন্য জমি প্রস্তুতি

আলফালফা চাষ করার জন্য নির্ধারিত জমিতে যদি জঙ্গল কিংবা অধিক আগাছা থাকে তবে প্রথমেই সেগুলো দুর করে নিতে হবে। অতঃপর জমিতে ৫-৬ বার আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি লাঙ্গল দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হবে। জমি তৈরীর সময় জমিতে হেক্টর প্রতি ২০-২৫ টন জৈব/গোবর সার দিতে হবে। এছাড়াও জমিতে হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন, ৭০ কেজি ফসফরাস এবং ৩০ কেজি পটাসিয়াম প্রয়োগ করতে হবে। আলফালফা শুটি জাতীয় ফসল বলে ফসফেট মিশ্রিত সার দিলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। জমি তৈরীর সময় হেক্টরে ২৫ কেজি সোহাগা বা বোরাকস প্রয়োগ করলে ভাল হয়।

আলফালফার বীজ বপন

আমাদের দেশে সাধারনত অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে অগ্রাহায়ন মাসের মাঝামাঝি) মাসে বীজ বপন করা যায়, তবে কার্তিক মাস বীজ বপনের উত্তম সময়। যে মাটিতে কখনও আলফালফা চাষ করা হয়নি সে মাটিতে আলফালফার বীজ বপনের সময় বীজের সঙ্গে রাইজোরিয়াম জীবাণু মিশিয়ে বুনলে ভাল হয়। এটা সম্ভব না হলে যে জমিতে আলফালফা চাষ করা হয়েছিল সে জমির কিছু মাটি বীজের সংগে মিশিয়ে বপন করা যেতে পারে। বীজ হাতে ছিটিয়ে অথবা ৩০ সে. মি. (প্রায় ১২ ইঞ্চি) অন্তর সারি ভাবেও বপন করা যায়। হাতে ছিটালে মই দিয়ে বীজ গুলোকে মাটি চাপা দিয়ে দিতে হবে। হেক্টরে আলফাআলফার বীজ লাগে প্রায় ১০-১৫ কেজি।

বীজ বপন পরবর্তি আগাছা দমন ও সেঁচ

আলফালফার বীজ বপনের পরে যখন জমিতে আগাছা জন্মে তখন ভাল ভাবে আগাছা দমন করতে হবে। এছাড়াও প্রত্যেকবার ফসল কর্তনের পরেও ভাল ভাবে আগাছা দমন করতে হবে। আলফালফা চাষের জন্য জমিতে প্রচুর পরিমানে পানির দরকার হয়। মাটি শুষ্ক হলে বীজ বপনের পরে হালকা সেচ এবং বপনের ১৫-২০ দিন পরে যখন গাছ ভাল ভাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে যায় তখন পর্যাপ্ত পরিমানে সেচ দিতে হবে। ফসল কর্তনের পরেও জমি পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

ফসল কর্তন ও উৎপাদন

আলফালফার বীজ বপনের প্রায় ৫০-৬০ দিন পরে গাছে যখন ১০-১৫% ফুল আসে তখন প্রথমবার ফসল কর্তন করার উপযুক্ত সময় এবং সে সময় গাছের উচ্চতা প্রায় ৫০ সে.মি. (১৮ ইঞ্চি) হয়। পরবর্তিতে সাধারনত ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর পর ফসল কাটা যায়। তবে জমির উর্বরতা, ঋতু, আবহাওয়া/জলবায়ু ইত্যাদি ভেদে ফসল কর্তনের সময়ের হেরফের অস্বাভাবিক নয়। তবে বছরে কম করে হলেও ৬ বার এবং সর্বোচ্চ ১০ বার ফসল কর্তন করা যায়। বছরে হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয় প্রায় ৬০-৮০ মেট্রিক টন কাঁচা ঘাস।

আলফালফার পুষ্টি গুণাগুণ

আলফালফা অধিক পুষ্টিসম্পন্ন একটি ফডার। নিম্নে আলফালফার পুষ্টি উপাদান ৩.৭ নং সারণীতে দেয়া হ'ল।

সারণী ৩.৭ঃ আলফালফার বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান

গাছের বিভিন্ন অংশে (লাগানোর পরে ১ম কর্তনের সময়)	শুষ্ক পদার্থ (%)	খনিজ পদার্থ (%)	আমিষ (%)	এডিএফ (%)	এনডিএফ (%)
গাছের পাতায়	২০.১৫	১৪.৭৬	২১.২৯	৫০.২০	৬৬.২২
গাছের কাণ্ডে	১৯.৮৬	১০.০৭	১৩.৫৬	৬৩.১৩	৬৭.২৫
পূর্ণাঙ্গ গাছে	১৯.৬৪	১২.৮৬	১৭.৭৯	৪৪.৭৮	৬৪.৭১

৩.৪ ঃ জলাবদ্ধ জমিতে চাষযোগ্য বহুবর্ষজীবি নন-লিগুমিনাস ঘাস

পারা ঘাস (*Brachiaria mutica*)

পারা বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৭-৮ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। এ ঘাসকে জলজ ঘাস বলা যায়। কারণ ইহা পানি প্রিয় ও স্যাঁতসেঁতে জমিতে ভাল জন্মে। তবে শুষ্ক জমিতেও পারা ঘাস উৎপন্ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে, ফলন কিছুটা কমে যাবে। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন থেকে আষাঢ় মাস। সীমিত লবনাক্ত এলাকা বা পাহাড়ী ঢালেও ঘাসটি জন্মে।

চাষ পদ্ধতি: প্রচলিত পদ্ধতিতে জমি চাষ দিতে হবে। হেঃ প্রতি ২৮-৩০ হাজার কাটিং প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দূরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে.মি এবং ৩৫ সে.মি.।

সার প্রয়োগঃ জমি প্রস্তুত কালীন হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। প্রতি কাটিং এর পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া।

সেচ: খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর।

ঘাস কাটার সময়: অঞ্চল ভেদে গ্রীষ্ম কালে ৩০-৩৫ দিন পর, শীতকালেঃ ৩৫-৪৫ দিন পর।

কাটিং সংখ্যা/বৎসর: ১ম বছর ৬-৭, পরবর্তী বছর গুলোতে ৭-৯ বার।

ঘাস উৎপাদন: ৮০-১২০ টন/হেঃ (বার্ষিক)

জার্মান (*Echinoclora crousgalli*)

জার্মান ঘাস পারা ঘাসের মত লতা জাতীয় ঘাস। ইহা উঁচু, নীচু, ঢালু, জলাবদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে এবং অন্য কোন ফসল বা শস্য হয় না ঐ সমস্ত জমিতে চাষ করা যায়। এ ঘাস গোবর সার ও গো-শালা বিধৌত পানিতে খুব ভাল জন্মে। এ সমস্ত জমিতে কোন সারের দরকার হয় না। কাঁদামাটি বা পানিতে রোপন করতে হয় বিধায় জমি তৈরীতে তেমন বিশেষ পরিচর্চার প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে জমি প্রস্তুত করার সময় গোবর সার বা ফার্মজাত পঁচানো আবর্জনা সার ছিটালে ভাল হয়। ঘাস কাটার পর হেঃ প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হয়।

জার্মান ঘাস উৎপাদন পদ্ধতি, ফলন এবং অন্যান্য পরিচর্যা পারা ঘাসের মত।

দল (*Hymenachne psedointerrupta*)

দল একটি দেশী বহুবর্ষজীবী জলজ ঘাস। পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে ঘাসের বৃদ্ধিও ঘটে। ঘাসটির উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে ইহা নীচু জলাবদ্ধ জমিতে চাষের উপযোগী। দল, জার্মান বা পারা ঘাস খামারের বর্জ্য পানি প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করে সারা বছর উৎপাদন করা সম্ভব। বছরে ৫-৬ বার কাটা যায়। শুকনো জমিতে পর্যাপ্ত পরিমান জলীয় অংশ থাকলে সার প্রয়োগ করে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

৩.৫ ঃ শস্য বিন্যাসে ও সাময়িক পতিত জমিতে মিশ্র ঘাস চাষ

শস্য বিন্যাসে ও সাময়িক পতিত জমিতে ঘাস চাষ

লাভজনক দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য সারা বছর ঘাস সরবরাহ প্রয়োজন। বছরব্যাপী ঘাস সরবরাহ দুইভাবে করা যেতে পারেঃ

- সারা বছর ঘাসের উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- যে মৌসুমে অধিক ঘাস উৎপাদিত হয় তখন উদ্বৃত্ত ঘাসের সংরক্ষণ।

বছর ব্যাপী ঘাস চাষ

বহুবর্ষজীবি ঘাস উৎপাদনের মাধ্যমে ঘাসের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা যায়। বহুবর্ষজীবি ঘাসের পাশাপাশি স্বল্প মেয়াদী ঘাস এককভাবে বা সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যেতে পারে। নীচে ঘাসের মিশ্র চাষের কিছু নমুনা দেয়া হল।

খাদ্য শস্য ও ঘাসের মিশ্র চাষঃ

(ক) নেপিয়ার- সারা বছর
(খ) নেপিয়ার- অক্টোবর হতে জুন পর্যন্ত-বন্যা প্রবণ এলাকা
(গ) ভুট্টা ও কাউপি- প্রচুর বৃষ্টিপাতের সময় ব্যতিত বছরের সব সময়ই চাষ করা সম্ভব
(ঘ) ভুট্টা ও খেসারী- শীতকাল
(ঙ) ভুট্টা ও মাসকালাই- শীতকাল এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ব্যতিত অন্যান্য সময়
(চ) ভুট্টা ও মাসকালাই + খেসারী- শীতকাল
(ছ) আমন ধান + খেসারী/ট্রিটিক্যালি - শীতকাল
(জ) আমন ধান + মাসকালাই + খেসারী- শীতকাল
(ঝ) ভুট্টা + ইপিল ইপিল-শীতকাল এবং অধিক বৃষ্টিপাত ব্যতিত বছরের অন্য সময়
(ঞ) ভুট্টা + আলফালফা- শীতকাল এবং অধিক বৃষ্টিপাত ব্যতিত বছরের অন্য সময়

বীজঃ

১। শুধু ভুট্টা : ৬৫ কেজি/হেক্টর
২। ভুট্টা + কাউপি : ভুট্টা ৪৫ কেজি ও কাউপি ৩০ কেজি/হেক্টর
৩। ভুট্টা + ইপিল ইপিল : ভুট্টা ৫৫ কেজি ও ইপিল ইপিল ১০ কেজি/হেক্টর
৪। ভুট্টা + আলফালফা : ভুট্টা ৪০ কেজি ও আলফালফা ১৫ কেজি/হেক্টর

সার প্রয়োগঃ

১। গোবর/জৈব সার : প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ টন
২। রাসায়নিক সারঃ বেসাল ডোজ : ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপি = ১০০ঃ ৮০ঃ ৪০ কেজি/হেক্টর
৩। টপ ড্রেসিং : ৫০-৭০ কেজি ইউরিয়া/হেক্টর

ফল গাছ ও ঘাসের মিশ্রচাষঃ

- ফলের গাছ (আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি) + সেন্ট্রোসোমা
- স্বপ মেয়াদী ফলের গাছ (পেঁপে, কলা ইত্যাদি) + ডাল জাতীয় ঘাস (মাসকালাই, খেসারী, সেন্ট্রোসোমা ইপিল-ইপিল)

অর্থকরী ফসল ও ঘাসের মিশ্রচাষঃ

- আঁখ + কাউপি বা খেসারী
- রাবার, নারিকেল, সুপারী + বহুবর্ষজীবি ঘাস (পারা, নেপিয়ার, সিগনাল, সেন্ট্রোসোমা)

রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, বাঁধ ও অন্যান্য পতিত জমিতে ঘাসের চাষ

উঁচু অব্যবহৃত পতিত স্থানসমূহে নিম্নলিখিত ঘাস সমূহ চাষ করা যায়

- নেপিয়ার + সেন্ট্রোসোমা
- পারা
- এন্ড্রোপোগন+ সেন্ট্রোসোমা
- ইপিল-ইপিল + পারা
- গ্লাইরিসিডিয়া + পারা

লাগানোর সময়ঃ বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে প্রথম বৃষ্টির পর পরই লাগানো।

৩.৬ ঃ পাহাড়ী ঢালুতে ঘাস চাষ

পাহাড়ের ঢালে আগাছা পরিষ্কার করে পুড়িয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে কনট্যুর পদ্ধতিতে ঘাস চাষ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাহাড়ের চুড়ার দিক হতে আড়াআড়িভাবে সারি করে ঘাস লাগাতে হবে এবং এভাবে আস্তে আস্তে পাহাড়ের নীচের দিকে যেতে

হবে। পাহাড়ের পাদদেশে ঘাসগুলোর মধ্যকার দূরত্ব ২০-২৫ সেঃ মিঃ, মাঝামাঝি অঞ্চলে ২৫-৩০ সেঃ মিঃ এবং চুড়ার দিকে ৩০-৩৫ সেঃ মিঃ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

- ঘাসের কান্ডের দুই মাথায় ২-৩ টি গিট রেখে চারা বা কাটিং লাইনের মধ্যে হেলিয়ে সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হবে।
- এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব হবে ৪০ সেঃ মিঃ, এক চারা হতে অন্য চারার ব্যবধান হবে ৩০ সেঃ মিঃ এবং মাটির ১০-১৫ সেঃ মিঃ গভীরে রোপন করতে হবে।
- প্রতি হেক্টর জমিতে ২০-২৫ হাজার চারা বা কাটিং প্রয়োজন।
- সারির মধ্যবর্তী খালি জায়গাগুলো আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সেই সাথে সার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত হারে সার দিতে হবে-

- ইউরিয়া ঃ হেক্টর প্রতি ২২০ কেজি
- ফসফেট (TSP) ঃ হেক্টর প্রতি ১২৫ কেজি
- পটাশ (MP) ঃ হেক্টর প্রতি ১২৫ কেজি
- গোবর সার ঃ হেক্টর প্রতি ৫ টন
- দুই সারির মাঝের ফাঁকা জায়গায় লিগুমিনাস জাতীয় ঘাস যেমন- কাউপি, মাটিকালাই, খেসারী ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব।
- চারা বা কাটিং লাগানোর ২০-৩০ দিন এবং প্রত্যেক কাটিং এর পর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া দিতে হবে।
- প্রথম কাটিং লাগানোর ৬০-৮০ দিনের মধ্যে ঘাস কাটতে হবে।
- পাহাড়ের ঢালুতে ঘাস শুধুমাত্র আর্দ্র মৌসুমেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

পাহাড়ী ঢালুর বিন্যাস অনুযায়ী প্রতি কাটিং-এ ঘাসের গড় এবং মোট উৎপাদন (মে-অক্টোবর) নিম্নরূপ

ঘাসের নাম	উঁচু (পাহাড়ের চুড়া) (টন/হেক্টর)	মধ্যম (টন/হেক্টর)	নিচু (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (টন/হেক্টর)
নেপিয়ার	৩২	২৮	৩৬	১২৯
পারা	১৪	২৯	১৭	৮০
এন্ড্রোপোগন	৩২	২৫	২৪	১০৮

শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর-এপ্রিল) পাহাড়ের পাদদেশের সমতল জমিতে একক ফসল হিসাবে ভুট্টা ও কাউপি অথবা মিশ্র ফসল হিসাবে ভুট্টা ও কাউপির উৎপাদন।

শস্য	মোট উৎপাদন (টন/হেক্টর)
ভুট্টা	২১
কাউপি	২৫
ভুট্টা+কাউপি	৪৭

উপরোক্ত পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালু জমির সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে উন্নত জাতের ঘাস যেমনঃ নেপিয়ার, পারা, এন্ড্রোপোগন ইত্যাদি সহজেই চাষ করা যায়, যার মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার গো-খাদ্যের চাহিদা অনেকটা পূরণ করা সম্ভব। অধিকন্তু, বর্ষা মৌসুমে পাহাড়ী ঢালে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ ঘাস সংরক্ষণ করলে শুকনো মৌসুমে গো-খাদ্যের সংকটও মোকাবেরা করা সহজ হবে। ফলতঃ মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, যা দারিদ্র বিমোচন এবং আত্ম কর্মসংস্থানে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

৩.৭ ঃ লবনাক্ত এলাকায় ঘাস চাষ

দেশের মোট ১২টি জেলার (কৃষি পরিবেশগত জোন ১৭, ১৮ ও ২৩) সমুদ্র উপকূলবর্তী জমির পরিমাণ প্রায় ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর। জেলাগুলো হচ্ছে নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পিরোজপুর, কক্সবাজার, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও ভোলা। এ জেলাগুলোতে লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এসব ঘাস চাষ করা যেতে পারে।

লবনাক্ত এলাকায় ঘাস চাষঃ

- যেখান থেকে পানি সহজেই নীচে নামতে পারে এমন জমি নির্বাচন করে তাতে চাষ ও মই দিতে হবে।
- সারা বছরই ঘাস লাগানো যেতে পারে। তবে জুন-জুলাই মাসে যখন বর্ষার মৌসুম শুরু হয় তখন ঘাস লাগানো ভালো।
- নেপিয়ার, বাজরা, অ্যারোসা এবং স্পেন্ডিডার কাটিং (২-৩টি কুশিযুক্ত) জমিতে বা লবণাক্ত এলাকাতে সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হবে। একটি কাটিং হতে অন্য কাটিং এর দূরত্ব হবে ৫০ সেঃ মিঃ।

- প্রথমবার বপনের ৬০-৮০ দিন পর এবং পরবর্তীতে প্রথম কাটিং এর ৩০-৭৫ দিন পরপর ঘাস কাটা যেতে পারে।
- ঘাস কাটার পর ৫-৭ সেঃ মিঃ লম্বা টুকরা করে অথবা আস্ত ঘাসই গরুকে খাওয়ানো যেতে পারে।
- অতিরিক্ত সবুজ ঘাস টুকরো করে অথবা আস্ত ঘাসই গর্তে সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়। ১০০ ঘনফুট মাপের একটি গর্তে ২.৫-৩.০ টন ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। তবে গর্তটি অবশ্যই একটু উঁচু জায়গায় করতে হবে যেখান হতে পানি নীচের দিকে নেমে যেতে পারে। গর্তটি গভীরতায় ৩ ফুট, চওড়ায় গর্তের তলায় ৩ ফুট, মাঝামাঝি জায়গায় ৪ ফুট এবং মুখে বা উপরের দিকের ১০ ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। গর্তের দৈর্ঘ্য ঘাসের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।
- সাইলেজ খুবই আঁটসাঁট ভাবে রাখতে হবে যাতে করে এর ভিতর কোন পানি বা বাতাস ঢুকতে না পারে। গর্তের সকল পার্শ্বে পলিথিন দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

৩.৮ঃ বছরব্যাপী ঘাস চাষ পরিকল্পনা

গবাদিপশু পালনে একজন খামারীর সারা বছরের খাদ্য সরবরাহ হিসাব করা প্রয়োজন। এ ধরনের হিসাব করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আঞ্চলিক পার্থক্য, শস্য চক্র, জমির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। আমাদের দেশে বছরে ৬টি ঋতু থাকলেও বৃষ্টি ও আর্দ্রতাকে নির্ভর করে সাধারণত ২টি উৎপাদন ঋতু পাওয়া যায়। যথা- ক) শুষ্ক মৌসুম ও খ) আর্দ্র মৌসুম সাধারণতঃ নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুম এবং অবশিষ্ট মাসগুলোতে মাটির অর্দ্রতা এবং বাতাসের জলীয়াংশের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। আর্দ্র মাসগুলোতে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশে অঞ্চলে বন্যা হয়। যার ফলে ঐ মাসগুলোতে বন্যাকবলিত অঞ্চলে কোনরূপ সবুজ ঘাস পাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে অঞ্চল ভেদে সবুজ ঘাস প্রাপ্তির একটি ছক নিম্নে সারণীতে ৩.৮ এ প্রদত্ত হল।

সারণী ৩.৮ঃ বন্যাকবলিত এবং বন্যামুক্ত অঞ্চলে সবুজ ঘাস উৎপাদনের ছক

অঞ্চল	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
বন্যাকবলিত অঞ্চল	—	—	—								—	—
বন্যামুক্ত অঞ্চল			—	—	—	—	—	—	—	—		

আমাদের দেশে গবাদিপশুর আঁশ জাতীয় খাদ্য ফসলের উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়। এগুলোর উৎপাদনের হিসেব নিম্নের ৩.৯ ছক হতে পাওয়া যেতে পারে।

সারণী ৩.৯ঃ বিভিন্ন ফসল ভিত্তিক আঁশ জাতীয় ঘাস প্রাপ্তির পরিমাণ নীচে প্রদত্ত হল

ফসলের নাম	আঁশ জাতীয় ঘাসের নাম ও পরিমাণ	
	নাম	পরিমাণ
ধান	খড়	ধান ও খড়ের অনুপাত ১ঃ১.৩
গম	খড়	গম ও গমের খড়ের অনুপাত ১ঃ১
ভুট্টা	ভুট্টা গাছ (স্টোভার)	ভুট্টা ও ভুট্টা খড়ের অনুপাত ১ঃ৩
আলু	আলু গাছ	আলু উৎপাদনের সহিত অনুপাত ৫ঃ১
কলা	কলা গাছ	কলা উৎপাদনের সহিত অনুপাত ১ঃ২
মাসকালাই, খেসারী, মশুর ইত্যাদি	ভূষি	শস্যদানা উৎপাদনের সহিত অনুপাত ১ঃ৪
আঁখ	আঁখের ডগা	আঁখের সহিত অনুপাত ৫ঃ১

এ ছাড়াও বিভিন্ন ফডার উৎপাদনের মাধ্যমে গবাদিপশুর খাদ্য চাহিদা পূরণ করা হয়। চাষকৃত বিভিন্ন ফডারের উৎপাদন মাত্রা ৩.১০ নং সারণীতে দেয়া হল। তবে, ক্ষেত্র ভেদে উৎপাদন কম বেশী হতে পারে।

সারণী ৩.১০ঃ বিভিন্ন ঘাসের বার্ষিক উৎপাদন মাত্রা

ঘাসের নাম	উৎপাদন মাত্রা (প্রতি একরে)
ভুট্টা	১৫-২০ টন
নেপিয়ার	৫০-৮০ টন
জাম্বু	২৫-৩০ টন
খেসারী	১২-১৫ টন
মাসকালাই	১০-১৫ টন

উল্লেখিত তালিকা হতে একজন খামারী সহজেই তার জমি হতে কতটুকু ঘাস উৎপাদন করতে পারবেন তা হিসেব করতে পারবেন, একজন খামারী তাঁর পালের গরুর জন্য বছরে কি পরিমাণ ঘাস সংগ্রহ করবেন তার একটি হিসাব নীচে ৩.১১ নং সারণীতে দেয়া হল।

সারণী ৩.১১ঃ খামারী নিজ জমিতে ঘাস উৎপাদন করলে ঘাস উৎপাদনের খরচ নিম্নরূপ হতে পারে

ঘাসের নাম	কিলো প্রতি উৎপাদন খরচ (টাকা)
ভুট্টা	২.০
নেপিয়ার	১.০
ট্রিটিক্যালি	১.৫
খেসারী	১.০
মাসকালাই	১.০

বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ ব্যবহারে একজন খামারীর প্লটে বছরব্যাপী ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা (বন্যামুক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য)।

বন্যামুক্ত এলাকার একজন খামারী দৈনিক ৫০ কিলো ঘাস তার গরুকে সরবরাহ করবেন অথবা সপ্তাহে ৩৫০-৪০০ কিলো ঘাস বিক্রি করবেন। এ ধরনের একজন খামারীর সর্বোচ্চ ৩০ শতক জমিতে বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ ঘাসটি চাষ করতে হবে। মনে রাখতে হবে নেপিয়ার ঘাস বছরের মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস ঘাস উৎপাদন করতে পারে, বাকী ৬ মাসে (নভেম্বর হতে এপ্রিল) বৃষ্টি কম, শীত এবং বাতাসে জলীয়াংশ কম থাকায় নেপিয়ারের উৎপাদন কমে যায়। তাছাড়া জমির মাটি আগলা, সার প্রয়োগ এবং আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি কাজের জন্য ও উক্ত ৬ মাস কেটে যায়। মে মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত ৬ মাসে মোট তিন বার ঘাস কাটা যাবে এবং ৩০ শতক জমি হতে সহজেই সর্বমোট ১৮-২৫ টন ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। উক্ত ১৮-২৫ টন ঘাস উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কারণে নষ্ট হওয়া ঘাস সহ সর্বমোট ৩২ শতক জমিতে ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা থাকতে হবে। উক্ত পরিকল্পনা নীচের ছকে দেখানো হল।

ব্লক-ক	ব্লক-খ			
১৬ শতক	৮ম সপ্তাহ ২ শতক	৭ম সপ্তাহ ২ শতক	৬ষ্ঠ সপ্তাহ ২ শতক	৫ম সপ্তাহ ২ শতক
	২ শতক ১ম সপ্তাহ	২ শতক ২য় সপ্তাহ	২ শতক ৩য় সপ্তাহ	২ শতক ৪র্থ সপ্তাহ

খামারীর করণীয়

(১) পুরো ৩২ শতক জমিকে সমান দু'টো ব্লক (ব্লক-ক ও ব্লক-খ) ভাগ করতে হবে।

(২) ব্লক-ক অথবা ব্লক-খ তে ৮টি প্লট তৈরী করতে হবে।

(৩) দু'টো ব্লকেই বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ ঘাসটি জানুয়ারী মাসের মধ্যে চাষ করতে হবে।

(৪) জমি চাষ এবং পরবর্তী পরিচর্যার জন্য পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(৫) যেহেতু নভেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত নেপিয়ার উৎপাদন হ্রাস পায় সেহেতু ব্লক-ক এ প্রতি কাটিং এ ৩.০-৩.৫ টন ঘাস উৎপাদন হবে। প্রতি কাটিং এর ঘাস মাটির গর্তে সাইলেজ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৬) ব্লক-খ এর প্রতি প্লটের প্রতি কাটিং এর ঘাস প্রতি সপ্তাহে সংগ্রহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে খামারী ইচ্ছা করলে প্রতি দিন ৫০-৬০ কিলো অথবা সপ্তাহের যে কোন দিনে মোট ৩৫০-৪০০ কিলো ঘাস সংগ্রহ করতে পারেন। এরূপ পদ্ধতি অনুসরণ

করলে প্রতি পূর্ণ চক্র ঘাস সংগ্রহ শেষ করতে ৮ সপ্তাহ প্রয়োজন হবে। এর ফলে এক চক্র শেষ করে পরবর্তী চক্র শুরু করা সম্ভব হবে। খামারী এভাবে তার গরুকে নিয়মিত সবুজ ঘাস সরবরাহ অথবা সপ্তাহের যে কোন দিন বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে পারবেন।

বন্যাকবলিত অঞ্চলের জন্য বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ উৎপাদন পরিকল্পনা

বন্যাকবলিত ও বন্যামুক্ত অঞ্চলের মধ্যে নেপিয়ার উৎপাদনের পার্থক্য নিম্নরূপ

(১) বন্যাকবলিত অঞ্চলের বন্যার পানি সাধারণত অক্টোবরের শেষের দিকে নেমে যায়। ঐ সময়ে কাঁদামাটিতে ঘাসের কাটিং, মোথা বা কান্ড পলি মাটিতে ফেলে দিতে হবে; কোন চাষাবাদ প্রয়োজন নেই।

(২) নেপিয়ারের সাথী ফসল হিসেবে খেসারী বা মাসকালাই ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৩) জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী মাসে খেসারী সংগ্রহের সময় একই সাথে নেপিয়ার ও সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) জমির মাটি কোদাল দিয়ে আলগা করে সার ও পানি প্রয়োগ করতে হবে।

(৫) জুলাই হতে অক্টোবর পর্যন্ত কোন ঘাস পাওয়া যাবে না এবং নেপিয়ার ঘাসও পঁচে যাবে।

(৬) বন্যাকবলিত অঞ্চলের জমি তুলনামূলকভাবে অধিক উর্বর থাকে। এ জন্য মার্চ হতে জুন মাসের মধ্যেই ন্যূনতম তিনবার ঘাস সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। অতএব, বন্যামুক্ত অঞ্চলের জন্য পূর্বে আলোচিত পরিকল্পনা মতো বছরের প্রয়োজনী সবুজ ঘাস উৎপাদন সম্ভব হবে।

৩.৯ : ট্রি ফডার

ইপিল-ইপিল

যতদূর জানা যায়, ইপিল-ইপিলের উৎপত্তি মধ্য আমেরিকায় এবং মেক্সিকোতে। ইপিল-ইপিল ডাল জাতীয় উদ্ভিদের সমগোত্রীয় এবং পাতাগুলো তেঁতুল গাছের পাতার মত। ইপিল ইপিল "Leguminosae" পরিবার এবং "Mimosoideae" উপ-পরিবার ভুক্ত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ইপিল ইপিল *Leucaena leucocephala* (Lam) dewit. নামে পরিচিত। সব প্রজাতীর ইপিল ইপিল উদ্ভিদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমনঃ ১। হাইওয়ান শ্রেণীঃ আকারে ছোট, ঘন ঝোপে পূর্ণ। উচ্চতা ৩-৮ মিটার পর্যন্ত। এরা ৩-৬ মাসের মধ্যে ফুল দেয় এবং সারা বছরই ফল হয়। ফুল থেকে প্রচুর বীজ পাওয়া যায়। পশু খাদ্য হিসেবে এই ইপিল ইপিল জাত খুবই উপযোগী। ২। পেরু শ্রেণীঃ উচ্চতা ৫-১২ মিটার পর্যন্ত হয়। অনেক শাখা-প্রশাখা ও ঝোপে পরিপূর্ণ। গো-খাদ্য হিসেবে বেশ উন্নত মানের। ৩। সালভাদর শ্রেণীঃ আকারে লম্বা, শাখা-প্রশাখা বেশ বিস্তৃত। উচ্চতা ২০ মিটার পর্যন্ত। সবুজ পাতা ও ডগা উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য হিসেবে পরিচিত।

কৃষি পরিবেশ

ইপিল ইপিল গ্রীষ্ম মন্ডলীয় উদ্ভিদ। গরমে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শীতে এদের বৃদ্ধি কমে যায়। যেখানে সারা বছর গড়ে ৬০০ থেকে ১৭০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এদের ফলন ভাল হয়। খরায় কোন ক্ষতি হয় না, এমনকি বৃষ্টি ছাড়াও ৮ মাস পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ইপিল ইপিল সাধারণতঃ দো-আঁশ জাতীয় মাটি, যেখানে পানি জমে থাকে না, সেখানে উৎপাদন ভাল হয়। মাটির ক্ষারতা ৭.৫, অম্লতা ৬ এর মধ্যে থাকলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারা গাছ জমিতে ১×১ মিটার ফাঁকে ফাঁকে লাগানো যেতে পারে। বৎসরের অন্য সময় লাগালে পর্যাপ্ত পানি দিতে হবে। এ ছাড়া জমিতে সরাসরি বীজ বপন করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। কিন্তু লাইনে লাগালে প্রতি হেক্টরে ১০-২০ কেজি বীজই যথেষ্ট। এ ছাড়া এ্যালে পদ্ধতিতেও ইপিল-ইপিল চাষ করা যায়। এ্যালে পদ্ধতিতে চাষের জন্য আগাছা মুক্ত করে গোবর সার (৩০০-৪০০ মন/হেক্টর) দিলেই চাষের উপযুক্ত হবে। এ্যালে পদ্ধতিতে ১ মিঃ × ১ মিঃ দূরত্বে জমির লম্বায় অথবা প্রস্থে লাইন করে ইপিল ইপিল গাছ লাগানো যায়। ৩/৪ লাইনের পর ১০ ফুট পর্যন্ত ফাঁকা রেখে পুনরায় ৩/৪ লাইন ইপিল ইপিল লাগালে সহজে পরিচর্যা করা যায়। জমির ফাঁকা অংশে যে কোন ফসল করা যায়। এ্যালে পদ্ধতিতে ইপিল ইপিল চাষ করা হলে একবার লাগানোর পর কমপক্ষে তিন বছর পর্যন্ত পশুখাদ্য হিসেবে গাছের ডগা ও পাতা ব্যবহার করা যায়।

চারা উৎপাদন

মার্চ-এপ্রিল (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য) মাসে বীজ বপন করা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াজাত বীজ, বীজ তলায় ৫ সেন্টিমিটার অন্তর অন্তর প্রতিটি বীজ ১.২ থেকে ১.৫ সেন্টিমিটার মাটির নীচে পুঁতে দিতে হয়। জুলাই-আগষ্ট (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে চারা রোপন করতে হয়। পলিথিনের ব্যাগেও চারা তৈরী করা যায়। মাটি ও গোবর সার (২ঃ১ ভাগ) ভাল ভাবে মিশিয়ে দুইটি করে বীজ পলিথিনের ২২×১০ সেন্টিমিটার ব্যাগে ১.৫ সেন্টিমিটার মাটির নীচে পুঁতে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে অথবা বৎসরের যে কোন সময় চারা গাছ তৈরী করা যায়।

উৎপাদন

বছরের মে মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি ৪৫ দিন (দেড় মাস) অন্তর ইপিল ইপিল পাতা ডগাসহ বছরে চার বার সংগ্রহ করা যায়। বাকী সময়ে কমপক্ষে একবার সংগ্রহ করা যায়। এভাবে সংগ্রহ করলে বছরে হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ টন পশু খাদ্য উৎপন্ন হবে। এর মধ্যে ৩৫ থেকে ৪০ টনই পশুর নিকট গ্রহনযোগ্য এবং বাকী ৫ টন উচ্ছিষ্ট জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায় এই ৫ টন জ্বালানী বিক্রী করে ১৫-২০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব। তাছাড়া, ইপিল ইপিলই একমাত্র গুটি উৎপাদনকারী গাছ যা হেক্টর প্রতি বছরে সর্বোচ্চ ২.১ টন আমিষ উৎপাদন করতে পারে। ।

প্রাণী খাদ্য হিসেবে সংগ্রহ ও ব্যবহার

ইপিল ইপিল গাছ লাগানোর প্রথম বছরই ১.৫০ মিঃ উচ্চতায় একবার ডাল-পালাসহ পাতা সংগ্রহ করা যায়। পরবর্তী বছর হতে একই উচ্চতায় বছরে কম পক্ষে পাঁচবার কাটা যায়। ইপিল ইপিল গাছের ডাল পালার নরম অংশে শতকরা ২৮-৩০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ থাকে। উক্ত অংশের শুষ্ক পদার্থে শতকরা ৯০-৯২ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ২৩-২৪ ভাগ আমিষ থাকে এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত থাকে প্রায় ১৫ঃ১। ঘাসটি খড় বা অন্যান্য অডাল জাতীয় ঘাসের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ষাঁড় বাছুরের দৈহিক ওজন দৈনিক ৩০০ গ্রাম হারে বৃদ্ধি পায়। উক্ত মিশ্রণের সাথে শতকরা দশ ভাগ চিটাগুড় দিলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি ৪০০ গ্রামের উপরে হবে। ছাগলের জন্য ইপিল ইপিল একটি উন্নতমানের খাবার হিসেবে পরিচিত। ইপিল ইপিলের পাতা রোদে শুকিয়ে গরু বাছুরকে অন্যান্য খাদ্যের সাথে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ হারে মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। অনেক খামারীবৃন্দের ধারণা ইপিল ইপিল খাওয়ালে গরু বা ছাগলের বিষক্রিয়া হয়। গরু বা ছাগলকে দীর্ঘদিন ইপিল ইপিল খাওয়ালে কোন বিষক্রিয়া হয় না। গরু বা ছাগলের পেটে এক ধরনের জীবাণু জন্মায় যা ইপিল ইপিলের বিষ জাতীয় পদার্থ মাইমোসিনকে ভেঙ্গে ডাইহাইড্রোক্সিপিরাডিন জাতীয় পদার্থে পরিণত করে যা মোটেই বিষাক্ত নয়। এজন্য প্রথম অবস্থায় গরু বা ছাগলকে অল্প অল্প করে খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হয়। পরে বেশী খাওয়ালেও কোন সমস্যা হয় না।

ইপিল-ইপিল সংরক্ষণ

(ক) শুকিয়ে সংরক্ষণঃ বৃষ্টির মৌসুমে ইপিল ইপিল খুব দ্রুত বাড়ে এবং প্রচুর পরিমানে সংগ্রহ করা যায়। এ সময়ে ইপিল ইপিলের পাতা রোদে শুকিয়ে চটের বস্তায় সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

(খ) সবুজ অবস্থায় সংরক্ষণঃ নরম ডাল-পালাসহ পূর্বের নিয়মে কেটে মাটির গর্তে শুধু ইপিল ইপিল ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। ইপিল ইপিল সবুজ ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়েও মাটির গর্তে সংরক্ষন করা যেতে পারে। প্রতি ১০০ কিলো সবুজ ঘাসের সাথে সর্বোচ্চ ১০ কিলো শুকনো খড় পরতে পরতে দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। এরূপ সংরক্ষণ পদ্ধতিতে চিটাগুড় ব্যবহৃত হয়। বৃষ্টির মৌসুমে এভাবে সংরক্ষণ করলে শুষ্ক মৌসুমে গর্ত থেকে তুলে গরুকে খাওয়ানো যায়।

উপসংহার

ইপিল-ইপিল চাষে পরিবেশ দুষণের কোন সম্ভাবনা নেই। বরং বৃক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একইসাথে পশুখাদ্য ও জ্বালানী উৎপাদনে প্রযুক্তিটি ব্যবহারে খামারীবৃন্দ উপকৃত হবেন। ছাগল ও ভেড়ার জন্য এটি একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

সজনে গাছ

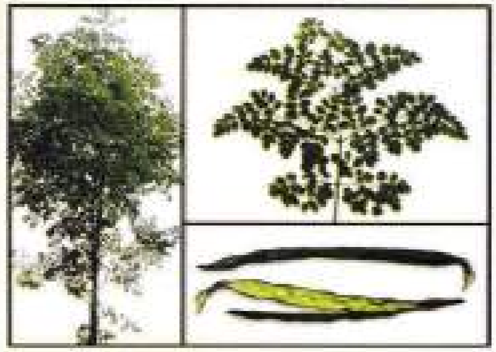

সজনে বা মরিঙ্গা (*Moringa oleifera*) Moringaceae পরিবারের একটি বেশ পরিচিত এবং বহুল চাষযোগ্য বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতি। সজনের এন্টি-অক্সিডেন্ট গুণাবলী এবং ব্যাপক পুষ্টিমানের জন্য এর ডাটা মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হলেও এটি প্রাণীজ ফডার হিসাবে মানসম্পন্ন প্রাণিখাদ্যের একটি বিকল্প উৎস হতে পারে। এটি স্বল্প খরচে সাশ্রয়ী খাদ্য তৈরিতে প্রচলিত খাদ্যের পরিপূরক কিংবা সম্পূর্ণ বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সজনে মূলতঃ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত এবং আফগানিস্তানের স্থানীয় দেশজ উদ্ভিদের একটি প্রজাতি।

সজনের প্রকার ভেদ

সারা বিশ্বে প্রায় ১৪ ধরণের সজনের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে, বাংলাদেশে সাধারনতঃ দুই ধরনের সজনে দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় ভাবে একটিকে সজনে বা সাজিনা এবং আর একটিকে লাজিনা বা বাজনা বলে। প্রথম প্রকারের সজনের ডাটা (ড্রামস্টিক) লম্বা, চিকন ও গোলাকার পরিধি। এর বীজের রং হয় সাদা এবং মার্চ এবং এপ্রিলে কুঁশি/ফুল উৎপন্ন করে। আর লাজিনার ডাটা দেখতে একটু খাট, মোটা ও ত্রিকোণাকার পরিধি বিশিষ্ট। এর বীজের রং কালো এবং মে-জুন মাসে ফুল ধরে। সজনে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এতে প্রচুর পরিমাণে আমিষ এবং খুব সামান্যই পুষ্টিঘাতি উপাদান (এন্টি-নিউট্রিয়েন্ট ফ্যাক্টর) রয়েছে।

সজনে গাছের বংশবিস্তার

সজনে গাছ যৌন এবং অ-যৌন উভয় পদ্ধতিতেই বংশ বিস্তার করে থাকে। গাছের শাখা কেটে লাগালে কিছু সমস্যা দেখা দেয় যেমনঃ এটা মাতৃগাছের বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস করে, এমনকি কখনও কখনও মারাও যায় এবং একটি বিশেষ আকারে না পৌঁছা পর্যন্ত এতে ফুল ধরেনা। বাংলাদেশে ঋতু ও বিরুদ্ধ প্রভাবকের উপস্থিতির ফলে সজনে বীজের অঙ্কুরোগমে সমস্যার কারণে সজনের যৌন প্রজননে বংশ বৃদ্ধির চেয়ে অ-যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারই শ্রেয়। যৌন প্রজননের অসুবিধা হচ্ছে অঙ্কুরোদগমের হার এবং সংরক্ষণ সময়ের সাথে এটি ঋণাত্মক ভাবে সম্পর্কিত। এই ধরণের সমস্যার ফলে দেশব্যাপী ছোট ছোট অথবা বৃহৎ বানিজ্যিক খামারিদের সুবিধার জন্য ঋতুর প্রভাব, মাতৃগাছের অপচয় দূর করে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত এর বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

কৃষিতাত্ত্বিক পরিবেশ

সজনে একটি উষ্ণমন্ডলীয় বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ। জলাবদ্ধ ভূমি ছাড়া সব ধরণের উঁচু জমি, পাহাড়ি এমনকি সমুদ্র তীরবর্তি লবনাক্ত জমিতেও এটি জন্মায়। তবে, বেলে-দোআঁশ মাটি উত্তম হলেও এঁটেল মাটিতেও সজনে হয়। সজনে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুতে বেশ সহিষ্ণু। এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু সজনে চাষের জন্য উপযুক্ত হলেও সাধারনতঃ ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রায় এটির উৎপাদন ভাল হয়। সজনের চাষাবাদের জন্য মাটির উত্তম মাত্রার পি.এইচ হচ্ছে ৫.০ থেকে ৮.০ (অম্লক্ষার)। ছায়াযুক্ত স্থানেও সজনে চাষ হয়। হাল্কা ঠান্ডা এবং ৪৮° সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করেও এটি বেঁচে থাকতে পারে। অধিক বন্যা এবং পানি জমে থাকা জমিতে সজনে টিকে থাকতে পারেনা।

সজনের চাষাবাদ পদ্ধতি

সজনে চাষাবাদ করতে গেলে সজনের ছোট ছোট চারাগাছ লাগবে। সে জন্য বীজতলা তৈরী করতে হবে। ১০ মিটার লম্বা এবং ৪ মিটার চওড়া একটি সমতল জমি ভালভাবে আগাছা দমন করে বেশ কয়েকবার চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে সুন্দর বীজতলা তৈরী করতে হবে। যদি ছোট ছোট পলিথিন ব্যাগে চারাগাছ তৈরী করা হয়, তবে এর জন্য প্রায় ১০০ কেজি বেলে দো-আঁশ মাটিতে ২৫-৩০ কেজি জৈব সার (গোবর, কম্পোষ্ট বা বায়োস্লারি), ১০০ গ্রাম ফসফেট এবং ৩০ গ্রাম পটাশ সার ভালভাবে মিশিয়ে ২-৩ দিন পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। অতঃপর অঙ্কুরোদগমের জন্য সজনের বীজগুলো প্রথমে পানিতে ভিজিয়ে ছাঁয়াযুক্ত একটি স্থানে কাপড় বা ছালার (চটের) মধ্যে ঢেকে রেখে দিতে হবে। অতঃপর ৬-৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৩-৪ ইঞ্চি প্রস্থ পলিথিনের ব্যাগে সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। পলিথিনের ব্যাগ গুলোতে পূর্বেই ৪-৫ টি ছিদ্র করে নিতে হবে, পানি বের হয়ে যাবার জন্য। ব্যাগ গুলো মাটিতে পূর্ণ হবার পরে প্রতিটি ব্যাগে ৪-৫ সে.মি. গভীরে অঙ্কুরোদগমের জন্য ভেজা ছালায় রাখা বীজ (১-২ টি করে) হাত দিয়ে বপন করতে হবে। বপনের প্রায় ৩০-৩৫ দিন পরে চারাগাছ জমিতে রোপন করা যাবে। উপরোক্ত মাপের বীজতলায় প্রায় ১৫০০ থেকে ১৮০০ টি চারাগাছ উৎপাদন করা যাবে।

বীজতলায় চারাগাছ উৎপাদনের সাথে সাথে বাণিজ্যিকভাবে সজনে (গবাদি প্রাণীর ফডার হিসাবে) উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত জমির আগাছা দমন করে ভালভাবে কয়েক দফা চাষ দিতে হবে। সেই সাথে জমিতে বিঘা প্রতি ১.৫ থেকে ২.০ টন জৈব সার বা গোবর সার, ১৫ কেজি ইউরিয়া, ২০ কেজি টিএসপি (ফসফেট সার) এবং ১০ কেজি এমপি (পটাস সার) সব জায়গায় ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগের জন্য জমি চাষের পূর্বেই মাটির রাসায়নিক নমুনা পরীক্ষা করে নেয়া সর্বোত্তম পন্থা। জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি সমান করার পরে ৪৫ সে.মি. ব্যবধানে আইল করতে হবে। তৈরিকৃত আইলে ৩০ সে.মি. পর পর একটি করে চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপনের পরে খেয়াল রাখতে হবে যেন, আইলে গর্তের পরিমাপ পলিথিন ব্যাগের মাটির পরিমাপে হয়। চারা লাগানোর প্রায় মাস খানেক পরে একর প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে (টপ ড্রেসিং) দিতে হবে। নিচে সারণী ৩.১২ এ সজনে চাষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হ'ল।

সারণী ৩.১২ঃ সংক্ষেপে সজনে গাছের চাষাবাদ ও উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলী

ক্রমিক নং	ভূ-প্রকৃতি ও কার্যক্রম	করণীয়
১।	উপযোগী আবহাওয়াঃ	নাতিশীতোষ্ণ, সাধারনতঃ ২৫-৩০° সে. তাপমাত্রায় ভাল হয়।
২।	মাটির প্রকৃতিঃ	বেলে দো-আঁশ, তবে এঁটেল মাটিতেও হয়। মাটির পি.এইচ ৫.০ থেকে ৮.০ (অম্লক্ষার)।
৩।	রোপনের সময়ঃ	বছরের যে কোন সময়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে এপ্রিল-মে মাস।
৪।	জমি তৈরীঃ	আগাছা দমন করে উত্তম ভাবে কয়েকবার চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে জমি সমান করতে হবে। অতঃপর ৪৫ সে.মি. দূরত্বে আইল করতে হবে।
৫।	সার-প্রয়োগঃ	জমি তৈরীর সময় বিঘা প্রতি জৈব সার ৪০-৫০ মন. ইউরিয়া ১৫ কেজি, টিএসপি ২০ কেজি এবং এমপি ১০ কেজি। প্রথমবার চারা রোপনের ৩০ দিন পরে এবং প্রতিবার ফডার কর্তনের পরে বিঘা প্রতি ১৫ কেজি হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
৬।	গাছের দূরত্বঃ	চারা রোপনের সময় এক গাছ থেকে আর এক গাছের দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি.
৭।	চারার সংখ্যাঃ	প্রতি বিঘা জমির জন্য চারা লাগবে প্রায় ২০০০ থেকে ২২০০ টি।
৮।	আগাছা দমন ও সেচঃ	জমিতে আগাছার উৎপাত ভেদে ২০-২৫ দিন পর পর আগাছা দমন এবং শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে জলীয় অংশের পরিমান ভেদে ১৫-২০ দিন পর সেচ দেয়া লাগে।
৯।	ফসলের (কর্তণ) সময়ঃ	চারা রোপনের ৪ মাস পরে প্রথমবার ফডার (পাতা ও কচি ডাল) সংগ্রহ করা যায়। পরবর্তিতে গ্রীষ্মকালে ১.৫ মাস পর পর এবং শীতকালে ২ মাস পর পর কচি ডালসহ পাতা হার্ভেষ্ট (কর্তণ) করা যায়। প্রথমবার মাটি থেকে ৬০ সে.মি. উপরে পাতাসহ ডাল-পালা কাটিতে হবে। এর পরে মাটি থেকে ৪-৫ ডাল রেখে পুরোটাই কাটিতে হবে। এভাবে প্রথম বৎসরে ৩-৪ বার এবং ২য় থেকে ৫ম বছরে সর্বমোট ৫-৬ বার ফডার সংগ্রহ করা যায়।
১০।	উৎপাদনঃ	বৎসরে প্রতি বিঘা জমি হতে ৩৫ মেট্রিক টন সবুজ বায়োমাস উৎপাদিত হয়।

প্রাণিখাদ্য হিসাবে সজনের ব্যবহার, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

সজনে গাছের পাতা এবং কচি কচি ডাল-পালা সংগ্রহ করে তাজা অবস্থায় চপিং (ছোট ছোট) করে সরাসরি কিংবা শুকনা খড়ের সাথে মিশিয়েও গবাদি প্রাণীকে খাওয়ানো যায়। এছাড়াও সজনের ম্যাশ, পিলেট এবং সাইলেজ করেও খাওয়ানো যেতে পারে। যেহেতু সজনে অধিক আমিষ সমৃদ্ধ একটি উদ্ভিদ, সেহেতু গবাদি প্রাণীর দানাদার খাদ্যের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করে খাদ্য খরচ অনেক কমানো যেতে পারে। নিম্নে সজনের প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হ'ল।

সজনের ম্যাশ তৈরী

সজনে গাছ থেকে কচি ডাল ও পাতা সংগ্রহ করার পরে চপিং মেশিন দ্বারা তা কুচি কুচি (২-৩ সে.মি.) করে কেটে পাকা ফ্লোরে কিংবা মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত এমন ভাবে রৌদ্রে শুকাতে হবে যাতে করে এর জলীয় অংশ ৮-১০% এর মধ্যে কমে আসে। বানিজ্যিক ভাবে এটি তৈরীতে শুকানোর জন্য প্রয়োজনে ড্রায়ার মেশিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

শুকানোর পরে এগুলোকে গ্রাইন্ডার মেশিনে গুঁড়া করে ম্যাশ তৈরী করা হয়। এই ম্যাশ অন্যান্য দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়, আবার দানাদারের বিকল্প হিসাবেও সরাসরি খাওয়ানো যায়। তৈরীকৃত ম্যাশ বস্তায় ভরে কিংবা পাকা ফ্লোরে রেখেও অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়।

সজনের পিলেট তৈরী

এটি তৈরী করতে যেহেতু মেশিনের প্রয়োজন, তাই কেবল বানিজ্যিক ভাবেই এটি তৈরী করা সম্ভব। পূর্বে তৈরীকৃত সজনের ম্যাশের সাথে আরো কিছু খাদ্যোপাদান, খনিজ, ভিটামিন এবং পিলেট বাইন্ডার একত্রে মিশিয়ে পিলেট মেশিনে চালনা করে সজনে পিলেট তৈরী করা যায়। এক্ষেত্রে, শতকরা ৬০ ভাগ সজনে ম্যাশ, ২৫ ভাগ গমের ভুষি, ১২ ভাগ গম ভাঙ্গা, ১ ভাগ ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট (ডিসিপি), ১ ভাগ খনিজ মিশ্রন এবং ১ ভাগ খাদ্য লবন একত্রে মিশিয়ে এর সাথে অতিরিক্ত শতকরা ০.৫ ভাগ পিলেট বাইন্ডার এবং ১.৫ ভাগ চিটাগুড় দিয়ে সজনে পিলেট তৈরী করা হয়। তৈরীকৃত সজনে পিলেট দানাদার খাদ্য হিসাবে গবাদি প্রাণীকে সরবরাহ করা যায়।

সজনের সাইলেজ তৈরী ও সংরক্ষণ

সজনে গাছ থেকে কচি ডাল-পালা সহ পাতা সংগ্রহ করার পরে সেগুলোকে চপার মেশিন দিয়ে ছোট ছোট (২-৩ সে.মি.) করে কাটতে হবে। সাধারনতঃ সদ্য হার্ভেষ্ট করা সজনের ডাল-পালা ও পাতার একত্রে জলীয় অংশ থাকে শতকরা ৮০ ভাগ। তাই, সজনের পাতাসহ ডাল-পালা কাটার পরে প্রয়োজনে কিছুক্ষণ রৌদ্রে শুকিয়ে যখন এর জলীয় অংশ শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ হবে তখন এটি বায়ুরোধক অবস্থায় প্লাষ্টিক ড্রাম, বাঁশের ডোল কিংবা পলিব্যাগে সাইলেজ হিসাবে সংরক্ষণ করা যায়। এক্ষেত্রে, শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ জলীয় অংশযুক্ত চপিংকৃত ডাল-পালা-পাতাকে প্লাষ্টিক ড্রাম কিংবা পলিব্যাগে এমন ভাবে চাপ দিয়ে ভরতে হবে যাতে ভেতরে কোন ভাবেই বাতাস না থাকে। প্রয়োজনে পরতে পরতে ভরে ভালভাবে চাপ দিয়ে ড্রাম কিংবা পলিব্যাগের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। এতে কোন ক্রমেই যেন পানি, বাতাস এবং সূর্যের আলো প্রবেশ না করতে পারে। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ এবং সু-স্বাদুর জন্য প্রয়োজনে সজনের সাইলেজে শতকরা ৫-১০ ভাগ হারে লালীগুড় মেশানো যেতে পারে। সংরক্ষিত সজনের সাইলেজ গবাদি প্রাণীকে সরাসরি কিংবা শুকনা খড় বা কাঁচা ঘাসের সাথেও মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

সজনের পুষ্টিমান ও গুণাগুণ

সজনে একটি দ্রুত বর্ধণশীল ট্রি-ফডার এবং এর পাতা উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ, যাতে বিভিন্ন ধরনের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বিদ্যমান। অধিকন্তু, গাছটিতে প্রয়োজনীয় খনিজ, রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধক উপাদান এবং সু-স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি এন্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন রয়েছে। এই গাছের সবকিছুই কোন না কোন কাজে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা যেমন মানুষ শাক হিসাবে খায়, আবার এর ডাল-পালা ও পাতা গো-খাদ্য ফডার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। সজনের ফল যা সজনে ডাটা হিসাবেই বেশি পরিচিত, এটি মানুষের একটি উপাদেয় খাদ্য এবং বাজারের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি সবজি। তাই, অধিক পুষ্টি ও গুনসম্পন্ন এই গাছটিকে ম্যাজিক-ট্রি বা মিরাকেল-ট্রি (অলৌকিক গাছ) বলা হয়ে থাকে। নিম্নে গবেষণা বিশ্লেষণে প্রাপ্ত সজনের পুষ্টিমান ৩.১৩ নং সারণীতে দেয়া হ'ল।

সারণী ৩.১৩ঃ সজনের পুষ্টিমান

ক্রমিক নং	পুষ্টি উপাদানের নাম	পুষ্টির পরিমান
১।	শুষ্ক উপাদান (ড্রাই-মেটার)	১৮.৬-২৪.৩ %
২।	ক্রুড ফাইবার (আঁশ)	৬.৬-৯.৬ %
৩।	ক্রুড প্রোটিন (আমিষ)	১৮.০-২২.৫ %
৪।	অ্যাসিড ডিটারজেন্ট ফাইবার (এডিএফ)	২৬.৮-৪১.৪ %
৫।	নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবার (এনডিএফ)	৩৪.৭-৪৫.০ %
৬।	ইথার এক্সট্রাক্ট (ক্রুড ফ্যাট)	২.৩-১০.০
৭।	ক্যালসিয়াম	২.০-২.২%
৮।	ফসফরাস	০.২-০.৩%
৯।	বিপাকীয় শক্তি (মেগাজুল/কেজি শুষ্ক পদার্থ)	৯.৩০-১১.৫

বিঃদ্রঃ উল্লেখ্য যে, সজনের পুষ্টিমান কাটিং বিরতি, কাটিং এর উচ্চতা এবং পাতা ও ডালের অনুপাত ভেদে তারতম্য হয়ে থাকে।

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রচলিত খাদ্যের বদলে সজনে খাদ্য খাওয়ালে দেশি গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ বেশি এবং ওজন বৃদ্ধি পায় শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ বেশি। সজনে খাদ্যে গাভীর দুধের ননীর পরিমান বাড়ে এবং কোলেস্টেরল কমে। সজনে গো-খাদ্যের আর্থিক বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, এটির আয়-ব্যয় অনুপাত ২.৫:১, অর্থাৎ এটির আয় উৎপাদন ব্যয়ের ২.৫ গুণ।

গ্লাইরিসিডিয়া

গ্লাইরিসিডিয়া (*Gliricidia sepium*) হচ্ছে ফ্যাবেসি (Fabaceae) পরিবারভূক্ত মধ্যম আকৃতির বহুবর্ষজীবি লিগুমিনাস জাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতি, যেটা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫ থেকে ৪০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এবং এর ডাল-পালা বেশ ছড়ানো (বড় ক্যানোপি) থাকে। গ্লাইরিসিডিয়া মেক্সিকোর উষ্ণমণ্ডলীয় শুষ্ক বনাঞ্চল ও মধ্য আমেরিকার একটি স্থানীয় উদ্ভিদ প্রজাতি যা বর্তমানে ক্যারিবিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চল, মধ্য আফ্রিকা, ভারতের কিছু অংশ এবং দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া সহ অনেক ট্রপিক্যাল এবং সাবট্রপিক্যাল অঞ্চলেও চাষাবাদ হচ্ছে। গ্লাইরিসিডিয়া পরিবেশ থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে এবং এরা ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ যেমনঃ কফি, চা, কোকোয়া জাতীয় গাছকে ছায়া প্রদানসহ, জ্বালানী কাঠ, চারণভূমির বেড়ার বা ভিটা-বাড়ির সীমানার জীবন্ত খুঁটি হিসাবে, সবুজ সারের গুরুত্বপূর্ণ উৎস, ভূমি ক্ষয়-রোধে পরিত্যক্ত বৃক্ষ, ইঁদুরের বিষ তৈরী ইত্যাদি সহ বহুবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। গ্লাইরিসিডিয়া গবাদি প্রাণী, ভেড়া ও ছাগলের কাট-এন্ড-কেরি ফরেজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গাছটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বার বার কাটলেও (ফডার হিসাবে) এটি মরে যায় না। ফডার হার্ভেষ্ট বা সংগ্রহের জন্য আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে ২ থেকে ৪ মাস পর পর কাটা যায়। অন্যান্য ফডারের সাথে ইন্টার-ক্রপিং হিসাবেও এটি চাষ করা যায়। এটি একটি উচ্চ আমিষ সমৃদ্ধ যা নিম্নমান সম্পন্ন ফরেজের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এটির বীজ এবং ছোট-বড় কান্ড দ্রুত বংশবিস্তারে কৃষকদের খুবই সহায়ক। ইপিল-ইপিল বৃক্ষের পরে সম্ভবত, এটিই ব্যাপক ভাবে চাষযোগ্য একটি কৃষি-বনজ বৃক্ষ।

গ্লাইরিসিডিয়ার উপকারিতা

গ্লাইরিসিডিয়ার উপর বেশ কিছু গবেষণা লব্ধ ফলাফলের কিছু সারমর্ম নিম্নে দেয়া হ'ল-

- এটা সহজেই মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আগাছার সাথে কার্যকরি প্রতিযোগীতায় অতি দ্রুত বেড়ে ওঠে,
- কাঁটামুক্ত এবং বহুবর্ষী উদ্ভিদ,
- ঘন ঘন ফডার হার্ভেষ্ট, চড়ে খাওয়া বা ব্রাউজিং এর পরেও অধীক উৎপাদনশীল,
- স্থানীয় কীটপতঙ্গ ও রোগ প্রতিরোধী,
- অধিক বীজ উৎপাদনশীল এবং অধিক ভেজিটেটিভ উৎপাদনের জন্য নির্ভরশীল,
- খুব কম এমনকি কোন সার দেয়ারই প্রয়োজন হয়না,
- আমিষ ও খনিজের পরিমান, গ্রহণযোগ্যতা এবং পরিপাচ্যতার ভিত্তিতে এটি একটি ভাল গুণ সম্পন্ন অধিক উৎপাদনশীল ফরেজ।

গ্লাইরিসিডিয়া গাছের বংশবিস্তার

গ্লাইরিসিডিয়া ফরেজ বৃক্ষ যৌন-প্রজনন (বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে) এবং অ-যৌন প্রজনন (গাছের কান্ড বা স্টেম কাটিং) উভয় পদ্ধতিতেই বংশ বিস্তার করে থাকে, যদিও কিছু প্রজাতি যেমনঃ ইপিল-ইপিলে বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের প্রচলন রয়েছে। অন্য দিকে, গ্লাইরিসিডিয়া খুব সহজেই কান্ড কিংবা বীজ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্টেম কাটিং এর মাধ্যমে গ্লাইরিসিডিয়া চাষের জন্য অনেক গবেষকই ছয় মাস বা তার বেশি বয়সের পরিপূর্ণ কান্ডের ৩ থেকে ৫ সে.মি. ব্যাসের ১.০ থেকে ১.৫ মিটার লম্বা খন্ডকে মাটির ১৫ সে.মি. গভীরে রোপন করার পরামর্শ দিয়েছেন। পরিপূর্ণ গাছে কান্ডের শেষ মাথায় ফুল ফোটে যেখানে কোন পাতা থাকেনা। ফুল থেকে যে ফলটি (পড) হয় সেটি প্রায় ১০ থেকে ১৫ সে.মি. (৪ থেকে ৬ ইঞ্চি) এর মত লম্বা হয়। কাঁচা অবস্থায় এটি দেখতে সবুজ, কিন্তু যখন এটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন তা দেখতে হলদে-বাদামি বর্ণের। একটি পডে ৪ থেকে

১০ টি গোলাকার বাদামী বীজ থাকে। এই বীজ অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে চারাগাছ ওঠে এবং বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, কান্ড কাটার ৩ দিনের মধ্যে তাজা অবস্থায়ই তা মাটিতে রোপন/পুঁতে দেয়া হয় এবং মাটির উপরের অংশটির শুকিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য তাতে মোম লাগিয়ে দেয়া অথবা ভেসেলিন, কাঁদা লেপে দেয়া কিংবা পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে। মাটিতে পোঁতা অংশটুকু কোন কোনে (অ্যাঙ্গেলে) কাটিতে হবে এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। কেউ একটু কোনাকৃতি করে কাটার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন যাতে করে শেষ প্রান্তের বাঁকল অংশটুকু বৃদ্ধি পায় যেখান থেকে শিকড় গজায়। আবার কেউ সোজা ভাবেই কাটার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে পঁচে যাবার অংশটুকু কম হয়। স্টেম কাটিং এর দু'টি অসুবিধাঃ গাছটির শেকড় খুব পাতলা ও দুর্বল হয়, যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির সংকটকালিন সময়ে শেকড় মাটির যথেষ্ট গভীরে গিয়ে পানির উৎসের কাছে যেতে পারেনা এবং প্রাণী যখন চড়ে খায় তখন গাছটি মাটিতে পরে যায়। দ্বিতীয়ত, এটার বিস্তারে অনেক পরিমান কান্ডের দরকার হয়। দেখা গেছে এ্যালি পদ্ধতিতে ১ হেক্টর জমিতে ৪ মিটার দূরত্বের গাছের সারিতে প্রায় ২৫ টন কাটিং এর প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, বীজের মাধ্যমে এটির বিস্তারে যে সমস্যা হয় সেটি হচ্ছে, গাছের ফলটি (পড) শুকিয়ে ফেঁটে বীজগুলো বের হয়ে ছড়িয়ে পরতে পারে। তাই সবুজ ও তাজা অবস্থায়ই পডগুলো সংগ্রহ করে রৌদ্রে এমন ভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সেগুলো অঙ্কুরোদগমের জন্য কার্যকরি থাকে।

গ্লাইরিসিডিয়া চাষের কৃষিতাত্ত্বিক পরিবেশ

গ্লাইরিসিডিয়া সাধারণত মধ্যম গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত সহ উষ্ণ এবং শুষ্ক মৌসুমে ভাল জন্মে। এটা সমুদ্র সমতল থেকে ১৬০০ মিটার উচ্চতায় সেই সকল এলাকায় ভাল হয়, যেখানে ৫ মাস শুষ্ক আবহাওয়া সহ গড় তাপমাত্রা থাকে ২০° সে. থেকে ২৯° সে. এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৯০০ মি.মি. থেকে ১৫০০ মি.মি. এর মধ্যে। গ্লাইরিসিডিয়া সাধারণতঃ অম্লীয় মাটিতে ভাল জন্মে যে মাটির পি.এইচ থাকে ৪.৫ থেকে ৬.২ এর মধ্যে। এছাড়াও এটি বেলে-মাটি, এঁটেল মাটি এবং চুনা-পাথর যুক্ত মাটিতেও জন্মে। এটা তুষারপাত এবং রাতে তাপমাত্রা ১৫° সে. এর নীচে টিকে থাকতে পারেনা। জলাবদ্ধ, অনাবৃষ্টি এবং কম উর্বর মাটিতেও এটা সহনীয়। পূর্ণ সূর্যের আলোতে এটি বেশ ভাল বৃদ্ধি পায়।

গ্লাইরিসিডিয়ার চাষাবাদ পদ্ধতি

গ্লাইরিসিডিয়া দুই ধরণের পদ্ধতিতে চাষ করা হয় যথাঃ এ্যালি ফার্মিং এবং নিবিড় খাদ্য বাগান (আইএফজি)। একই ধারণার ভিত্তিতেই দুইটি পদ্ধতিতে এর চাষাবাদ হয়ে থাকে যেটি হচ্ছে, হয় এটা একক ভাবে অথবা অন্য কোন ফরেজ অথবা অ্যারেবল শস্যের সাথে মিশ্রভাবে চাষ (অ্যালি ফার্মিং)। উভয় পদ্ধতিতেই বায়োমাস উৎপাদন অনেক বেশি। গ্লাইরিসিডিয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উপযুক্ত ঘনত্ব হচ্ছে প্রতি বর্গমিটারে ২৫ টি গাছ। ৮ সে.মি. ব্যবধানে বীজ রোপনে হেক্টর প্রতি প্রায় ২৫০০০ গাছ রোপন করা যায়, যেটি সর্বোচ্চ উৎপাদনের উপযোগী। অন্য কথায়, বীজ থেকে প্রতিষ্ঠিত গাছ ফডার উৎপাদনের জন্য বেশি উপযোগী। অনেকেই গাছের ঘনত্বের উপর পাতা উৎপাদনের প্রভাব বিবৃত করেছেন। তাঁরা বলেছেন গাছের ঘনত্ব বাড়ালে প্রতি একক পরিমান জায়গায় উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। অন্য কথায় যদি বেশি পরিমান পাতা উৎপাদনই লক্ষ্য হয় তবে, গাছের ঘনত্ব বাড়াতে হবে। যদিও প্রতি বর্গমিটারে ১-১৩ টি গাছ লাগানো হয়ে থাকে তথাপি, সবচেয়ে উপযুক্ত ঘনত্বের কথা এই জন্যই বলা হয় না, কারণ এটির উৎপাদন ঋতু, বৃষ্টিপাত এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্বের কারণে হেরফের হয়ে থাকে।

গ্লাইরিসিডিয়া হার্ভেষ্টের সময় এবং এর বায়োমাস উৎপাদন

যদিও গ্লাইরিসিডিয়া সারাবছরই সবুজ থাকে, বিশেষ করে যখন নিয়মিত বিরতিতে এটা কাটা হয়, তবে শুষ্ক মৌসুমে এর ভেজিটেটিভ বৃদ্ধি কম হয়। যে পদ্ধতিতেই চাষ করা হউক না কেন, গ্লাইরিসিডিয়ার উৎপাদনে পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শুধু উৎপাদনকেই প্রভাবিত করেনা, প্রথম হার্ভেষ্টের সময়, হার্ভেষ্ট বিরতি, হার্ভেষ্টের ঋতু ও গাছের উচ্চতা সহ দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীলতায়ও প্রভাব পরে। গ্লাইরিসিডিয়া লাগানোর প্রথম বছরেই ঘন ঘন ফডার হার্ভেষ্ট করলে পরবর্তি বছর গুলিতে এর উৎপাদন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, গাছ লাগানোর ১-৩ বছরের মধ্যে বছরে ১-২ বার ফডার হার্ভেষ্ট করলে পরবর্তি বছরগুলিতে ভাল ফল পাওয়া যায়। অনেকের মতে, যত দেরিতে প্রথমবার হার্ভেষ্ট করা হয় ততই দ্রুত পূণঃবৃদ্ধি ও অধিক বায়োমাস উৎপাদন হয়, কারণ বয়স্ক গাছের মোটা কান্ড থাকে, ফলে এতে বেশি পরিমান শর্করার মজুত থাকে এবং এর শীকড় অনেক বিস্তৃত ও গভীরে থাকে। গাছ ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পরে বর্ষাকালে প্রতি ২-৩ মাস এবং শীতকালে প্রতি ৩-৪ মাস অন্তর অন্তর ফডার সংগ্রহ করা যায় এবং হার্ভেষ্টের পূর্বে এটি ১-২ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। ফডার প্লটে গ্লাইরিসিডিয়ার শুষ্ক বায়োমাস উৎপাদন প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ৫ থেকে ১৫ টন।

প্রাণি খাদ্য হিসাবে গ্লাইরিসিডিয়ার ব্যবহার, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ

গ্লাইরিসিডিয়া দ্রুত বর্ধণশীল একটি ট্রি-ফডার যা শুষ্ক মৌসুমেও (শীতকালে) পাতা ধরে রাখে যখন সাধারনতঃ অনেক বৃক্ষ সহ ফরেজ গাছের পাতাও ঝরে যায়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসুমে এটিই কেবল প্রাণী খাদ্যের উৎস হয়ে থাকে। গ্লাইরিসিডিয়া উষ্ণমন্ডলীয় ফরেজ বৃক্ষের মধ্যে অধিক আমিষ ও উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন অন্যতম একটি ফরেজ গাছ। গ্লাইরিসিডিয়া ফরেজ হাত দ্বারা কেটে ভূমিতে ছড়িয়ে প্রাণীকে চড়ে খাওয়ানো যায় অথবা এগুলো খোয়াড়ে নিয়েও প্রাণীকে সরবরাহ করা যায়। গ্লাইরিসিডিয়া চপিং করে ঘাস কিংবা ভূট্টার গাছের সাথে মিশিয়ে সাইলেজও করা যায়। গাঁজন যোগ্য শর্করার জন্য এতে কিছু খাদ্য সহযোগী যেমনঃ চিটাগুড়, ইক্ষু অথবা ফরমিক এসিড (০.৮৫%) যোগ করা যেতে পারে। গাছের বয়স, অঙ্গ, কর্তণের সময়, ঋতু এবং এলাকা ভেদে ফডার বৃক্ষ এবং বনজ বৃক্ষ (শ্রাব)-র পুষ্টি উপাদানে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গড়-পরতায়, ফডার ও বনজ বৃক্ষে অন্যান্য উষ্ণমন্ডলীয় ঘাসের চেয়ে আমিষের পরিমান বেশি থাকে এবং আঁশ ও খনিজ উপাদান কম থাকে। যখন শুষ্ক মওশুমের সাথে তুলনা করা হয় তখন পার্থক্যটা আরোও প্রকট হয়। শুষ্ক, পূর্ণতাপ্রাপ্ত উষ্ণমন্ডলীয় অন্যান্য ঘাসে ক্রুড প্রোটিনের পরিমান প্রায়ই শতকরা ৬ ভাগের চেয়ে কম থাকে যা প্রাণীর স্বাভাবিক দেহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন, সেখানে অনেক ফডার বৃক্ষই সবুজ ও অধিক আমিষ যুক্ত থাকে। নিম্নে ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণে প্রাপ্ত গ্লাইরিসিডিয়ার কিছু পুষ্টি গুণাগুণ দেয়া হ'ল। নিচে ৩.১৪ নং সারণীতে গ্লাইরিসিডিয়ার পুষ্টিমান দেয়া হ'ল।

সারণী ৩.১৪ঃ গ্লাইরিসিডিয়ার পুষ্টিমান ও গুণাগুণ

ক্রমিক নং	পুষ্টি উপাদানের নাম	পুষ্টির পরিমান
১।	শুষ্ক উপাদান (ড্রাই-মেটার)	২০.০ %
২।	ক্রুড ফাইবার (আঁশ)	২০.৭ %
৩।	জৈব পদার্থ (অর্গানিক মেটার)	৯০.০ %
৪।	ক্রুড প্রোটিন (আমিষ)	২৩.০ %
৫।	অ্যাসিড ডিটারজেন্ট ফাইবার (এডিএফ)	২৮.৭ %
৬।	নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবার (এনডিএফ)	৪২.৮ %
৭।	মোট খনিজ উপাদান (টোটাল অ্যাশ)	৯.৭ %
৮।	ক্যালসিয়াম	১.৩ %
৯।	ফসফরাস	০.২ %
১০।	জৈব উপাদানের পরিপাচ্যতা	৫৩.৯ %

গ্লাইরিসিডিয়ার সীমাবদ্ধতা

অ-রোমন্থক প্রাণীর (যেমনঃ পোল্ট্রি, বেড়াল) ক্ষেত্রে গ্লাইরিসিডিয়া বিষক্রিয়া প্রদর্শণ করতে পারে। প্রচলিত পন্থায় গ্লাইরিসিডিয়ার বিষাক্ত বীজ ও গাছের বাকল বা ছাল ইঁদুর নিধণে ব্যবহারের সূত্র ধরেই এর জেনেরিক নাম হয়েছে "গ্লাইরিসিডিয়া" যার অর্থ "ইঁদুর ঘাতক"। গবাদি প্রাণীর গ্লাইরিসিডিয়া গ্রহণ যোগ্যতার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনঃ গন্ধের কারণে প্রাণী এটি খেতে অনিহা দেখায়, কিন্তু এটা ব্যবস্থাপনা ও ভূ-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এর আর একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এটি তুষার (ফ্রস্ট) সহ্য করতে পারে না এবং এটি উষ্ণমন্ডলীয় উদ্ভিদ বিধায় ঠান্ডা মৌসুমে সহজে খাপ খাওয়াতে পারেনা। এটা চাষের ক্ষেত্রে পরাগবাহীর প্রয়োজন হয় (স্ব-পরাগী নয়) এবং বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য শুষ্ক মৌসুমের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও, এর ইনভেসিভ দক্ষতা রয়েছে; যেমন এর তড়িত বিস্তারের জন্য অনেক দেশে এটিকে আগাছা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এখন পর্যন্ত এই বৃক্ষটি মারাত্মক উদ্ভিদ রোগ থেকে মুক্ত, কেবলমাত্র বাইরের পরিবেশে কিছু কীট-পতঙ্গের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় পাতা ঝড়তে (ডি-ফলিয়েশন) দেখা যায়। ফডার এবং বনজ বৃক্ষে (শ্রাব) উচ্চ মাত্রায় ক্ষতিকারক উপাদান থাকতে পারে, যেটা প্রাণীর জন্য অগ্রহণযোগ্য অথবা ক্ষতিকর, যদি তা বেশি পরিমানে খেয়ে ফেলে। ইপিল-ইপিল ফডার বৃক্ষে যেমন ক্ষতিকর মাইমোসিন রয়েছে (০.৩-৭.১%), তেমনি গ্লাইরিসিডিয়ায় ২-২.৩% ট্যানিন রয়েছে। ট্রি-ফডারের এই সমস্ত ক্ষতিকর বা বিষাক্ত উপাদান দূর করার বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। উইলটিং (নির্জীব করা), শুকানো (হে তৈরী), সিদ্ধ করা, রাসায়নিক উপাদান সংযোগ কিংবা অন্য খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয়ে যায়।

মডিউল-৪
বাণিজ্যিকভাবে ঘাস উৎপাদন ও আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ

আলোচিত বিষয় সমূহ

৪.১. বাণিজ্যিকভাবে উপযোগী উন্নত জাতের ঘাস চাষাবাদ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব

৪.২. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে খামারীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারনা পাবেন:

- বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য উন্নত জাতের ঘাস বা ফডার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- অঞ্চল ভিত্তিক কি ধরণের ঘাস বাণিজ্যিক চাষের উপযোগী সে সমন্ধে জানতে পারবে।
- বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত ঘাসের বাজার ব্যবস্থা সমন্ধে ধারণা পাবে।
- বাণিজ্যিক ভাবে ঘাস উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের হিসাব সমন্ধে ধারণা পাবে।
- বাণিজ্যিক ঘাস উৎপাদন কিভাবে জীবিকায়নের উৎস হতে পারে সে বিষয়ে ধারণা পাবে।

৪.৩ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব

- যে কোন একটি ফডার চাষ করে আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ বৎসরে কত টাকা মুনাফা হবে তার একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রশিক্ষক খামারিদের কাছ থেকে আদায় করে নিবেন।

জাম্বু ঘাস

পরিচিতি

জাম্বু একটি বহুবর্ষজীবি উচ্চ ফলনশীল ঘাস যাকে ইংরেজীতে বলা হয় "Sorghum"। জাম্বু ঘাস সারা বিশ্বে বহুল পরিচিত ও উৎপাদিত একটি হাইব্রিড জাতের ঘাস। বিভিন্ন প্রকার সরগাম জাতীয় ঘাসের (সরগাম বাইকালার ও সরগাম সুদানিজ) সংকরায়নের মাধ্যমে হাইব্রিড জাম্বু গ্রাস ঘাসের উদ্ভাবন করা হয়। যদিও এই ঘাসের উৎপত্তিস্থল অস্ট্রেলিয়ায়, তথাপি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবাদি প্রাণির খাদ্য হিসাবে এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ঘাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি স্বল্পতম সময়ে অনেক বেশি উৎপাদনশীল। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অল্প জায়গায় ঘাস চাষ করে পারিবারিক পর্যায়ে এবং বাণিজ্যিকভাবে গবাদি প্রাণির খামার পরিচালনা করতে জাম্বু গ্রাস হাইব্রিড ঘাস অত্যন্ত সহায়ক। এমনকি বাণিজ্যিক লক্ষ্যে বেশি জায়গায় এ ঘাসের চাষ করে স্থানীয় পর্যায়ে অন্য খামারিদের নিকট উৎপাদিত ঘাস বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। জাম্বু ঘাস সাধারনতঃ বীজ বপনের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয় এবং একবার লাগালে ২-৩ বছর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময় পর পর গোড়া থেকে কিছুটা উপরে কেটে মাটিতে সার এবং পানি দিলে পুণরায় গোড়া থেকে আবার বৃদ্ধি পায়।

জাম্বু চাষের উত্তম সময়

যদিও ঘাসটি সারাবছরই চাষ করা যায় তথাপি এটি চাষের উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন-চৈত্র মাস (ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল)। জলাবদ্ধ ভূমি, লবনাক্ত মাটি ও পাহাড়ী ঢাল ছাড়া সব ধরনের মাটিতেই ঘাসটি জন্মে।

ব্যবহার

গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে ঘাসটি সরাসরি অথবা শুকনা খড়ের সাথে মিশিয়ে কিংবা সাইলেজ তৈরী করেও খাওয়ানো যায়।

জাম্বু ঘাসের প্রকারভেদ

জাম্বু ঘাসের অনেক প্রকার উপজাত (কালটিভার) রয়েছে, তম্মধ্যে বাংলাদেশ প্রানিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে ছয় প্রকার কালটিভার নিয়ে গবেষণা হয়েছে যার ফলাফল এখানে তুলে ধরা হবে। উল্লেখিত ছয় প্রকার কালটিভারের নাম হচ্ছেঃ সুইট জাম্বু (Sweet Jumbo), প্রোলিন (Proline), দেবগিরি (Deb Giri), সাফাল সুদান (Safal Sudan), মিকু জাম্বু (Mykoo Jumbo) এবং হোয়াইট সিড (White seed)।

চিত্রঃ কয়েক প্রকারের জাম্বু ঘাসের ছবি

জাম্বু ঘাসের চাষাবাদ প্রণালী

জাম্বু ঘাসের চাষাবাদ প্রণালী অন্যান্য ফসলের মতই, তবে এখানে জমি তৈরী, বীজ বপন বা কাটিং লাগানো, সার প্রয়োগ ও ফসল উৎপাদনের সময় ও ফসল আরোহনের মধ্যে কিছু তারতম্য রয়েছে। প্রথমেই নির্বাচিত জমিকে উত্তম ভাবে চাষ দিতে হবে। তবে বন্যা পরবর্তি কাঁদামাটি জমিতে চাষ ছাড়াই বীজ বপন কিংবা কাটিং (গাছের গোড়ার মোথা) লাগানো যায়। জমি প্রস্তুতকালীন সময়ে মাটিতে ভালভাবে সার ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর মাটিকে ঝুরঝুরে করে উপরের তল সমান করে নিতে হবে। যদি বীজ রোপন করা হয় তবে পরবর্তিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর লাইন ধরে কেইল (সামান্য গর্ত) তৈরী করা হয়। এক্ষেত্রে, জমির একমাথা থেকে আরেক মাথায় একটি রশি বেঁধে নিয়ে রশি বরাবর একটি শক্ত কাঠি (লোহার কিংবা বাঁশের) লাঙলের মত টেনে নিলে মাঝখানের মাটি দুই দিকে সরে সামান্য গর্ত তৈরী হবে যেখানে বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। বীজ ছেটানো হলে প্রতিটা কেইলের

সরে যাওয়া মাটি দিয়ে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। পুরো জমিতে একবার মই দিয়েও বীজ ঢেকে দেয়া যায়। সবশেষে শুষ্ক জমি হলে হাল্কা পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই মাটি ভেদ করে গাছের চারা গঁজিয়ে উঠবে। চারা গঁজানোর পরে প্রয়োজন মাফিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর আগাছা দমন করতে হবে, না হলে বৃদ্ধি ব্যহত হবে। যদি জমিতে কাটিং লাগানোর মাধ্যমে ফসল ফলানো হয় তবে প্রতিটা কেইলের নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর কাটিং রোপন করে গোড়া মাটি দিয়ে চেপে দিতে হবে। এক্ষেত্রেও কাটিং রোপনের পরে পানি দেয়া বা হাল্কা সেচ দেয়া যেতে পারে। চাষাবাদ সম্পর্কিত আরো খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিম্নে দেয়া হলঃ

সার প্রয়োগঃ প্রতি হেক্টর জমির জন্য বিভিন্ন সারের মাত্রা হচ্ছেঃ

ইউরিয়া = ৫০ কেজি
টিএসপি = ৭০ কেজি
এমপি = ৩০ কেজি
গোবর/জৈবসার/বায়োস্লারি = ২৫ টন

উক্ত পরিমান সারগুলি জমি প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রয়োগ করতে হবে এবং ঘাস লাগানোর ১ মাস পরে পূণরায় হেক্টর প্রতি আরো ৫০ কেজি ইউরিয়া সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার ঘাস কেটে নেয়ার পরেও হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি করে ইউরিয়া সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সেঁচঃ মাটির আর্দ্রতা বুঝে খরা মৌসুমে সাধারনতঃ ১৫ থেকে ২০ দিন পর পর জমিতে ভালভাবে সেঁচ দিতে হবে। এছাড়াও প্রতিবার ঘাস কেটে নেয়ার পরে সার প্রয়োগ কালিন সময়েও সেঁচ দিতে হবে।

চিত্রঃ জমি প্রস্তুতের সময় সার প্রয়োগের ছবি

চিত্রঃ জমি প্রস্তুতির সার্বিক চিত্র

বীজ বা কাটিং প্রয়োগঃ প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৭ থেকে ১০ কেজি বীজ সারিবদ্ধ ভাবে বোপন করতে হবে। কাটিং এর ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৩৫ থেকে ৪০ হাজার মোথা উপরোল্লিখিত বর্ণনা মোতাবেক বপন করতে হবে। বীজ কিংবা কাটিং/মোথার ক্ষেত্রে এক লাইন/সারি থেকে আর এক লাইনের দূরত্ব হবে প্রায় ৭০ সেন্টিমিটার (২৮ ইঞ্চি) এবং কাটিং এর ক্ষেত্রে এক কাটিং থেকে আর এক কাটিং এর দূরত্ব হবে প্রায় ৩৫ সেন্টিমিটার (১৪ ইঞ্চি)।

ঘাস কাটার সময় এবং সর্বমোট কাটিং সংখ্যাঃ সাধারনতঃ ঘাস কাটার সময় এবং কতদিন পর পর ঘাস কাটা যাবে তা নির্ভর করে ঘাসের বৃদ্ধির উপর যা জমির গুণাগুন, সারপ্রয়োগ, আগাছা দমন, সেচ এবং ঋতুর উপর নির্ভরশীল। প্রথমবার বীজ বপন কিংবা মোথা রোপনের পরে গ্রীষ্মকালে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ দিন এবং শীতকালে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ দিন পরে প্রথমবার ঘাস কাটা যায় এবং এর পর থেকে উক্ত ঋতুদ্বয়ে যথাক্রমে ৩০ থেকে ৩৫ এবং ৪০ থেকে ৪৫ পর পর ঘাস কাটা যায়। এভাবে একবার ফসল লাগালে বছরে প্রায় ৩ থেকে ৪ বার ফসল পাওয়া যায়।

মোট ঘাস উৎপাদনঃ জমির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকলে প্রতি হেক্টর জমি থেকে প্রতিবার কাটিং এ ১০০ থেকে ১৫০ মেট্রিক টন কাঁচাঘাস পাওয়া যায়।

পুষ্টিমানঃ প্রতি কেজি জাম্বু কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান হচ্ছে নিম্নরুপঃ

শুষ্ক উপাদান (পানি ছাড়া পুষ্টি উপাদান)	= ১৯০ গ্রাম
জৈব উপাদান	= ১৮০ গ্রাম
অশোধিত আমিষ (ক্রুড প্রোটিন)	= ২১ গ্রাম
বিপাকীয় শক্তি (মেটাবলাইজেবল এনার্জি)	= ১.৯৫ মেগাজুল

বায়োমাস উৎপাদন/ফলন

যে কোন ফসল চাষের উদ্দেশ্য হচ্ছে শস্য উৎপাদন। ধান গাছ চাষের উদ্দেশ্য ধান উৎপাদন। চা গাছ চাষের উদ্দেশ্য হচ্ছে চা পাতা উৎপাদন। তদ্রুপ ঘাস চাষের উদ্দেশ্য হচ্ছে গবাদীপশুর খাদ্যের জন্য ঘাস উৎপাদন। একই পরিমান জমিতে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তদ্রুপ বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকারের ঘাসের উৎপাদনেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারাইটি বা উপজাতের ঘাসের উৎপাদনেও সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নের ৪.১ নং টেবিলে বিএলআরআই-র গবেষণায় প্রাপ্ত জাম্বু ঘাসের ছয়টি উপজাতের বিভিন্ন সময়ে আহরিত বায়োমাস ফলন দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত ছয়টি ঘাস ৪৫ দিন, ৬০ দিন, ৭৫ দিন এবং ৯০ দিনের সময় কর্তন করে তাদের বায়োমাস ফলন নির্ণয় করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৬০ দিন পর্যন্ত সুইট জাম্বুর বায়োমাস ফলন অন্য ৫ টি ঘাসের তুলনায় বেশী। অর্থাৎ এই সময় পর্যন্ত সুইট জাম্বুর বৃদ্ধি বেশী অতঃপর উৎপাদন কমতে থাকে। ৭৫ দিনের সময় দেবগিরি জাম্বু ঘাসের উৎপাদন বেশী এবং ৯০ দিনের সময় সাফাল সুদান এবং মিকু জাম্বুর উৎপাদন বেশী। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, উল্লেখিত চারটি সময়ে ঘাস উৎপাদনের পরিমানে যে পার্থক্য তা কেবল মাত্র সুইট জাম্বু ঘাসের ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ অন্য পাঁচটি ঘাসের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং, স্বল্প সময়ে অধিক ঘাস উৎপাদনের জন্য সুইট জাম্বুই খামারীদের জন্য উত্তম।

টেবিল ৪.১ঃ প্রতি হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাম্বু কালটিভারের বিভিন্ন পর্যায়ে বায়োমাস উৎপাদন

কালটিভারের নাম	রোপনের পরে পরিপক্কতার বয়স (উৎপাদনের পর্যায়)				মন্তব্য
	৪৫ দিন	৬০ দিন	৭৫ দিন	৯০ দিন	
সুইট জাম্বু	১৫০ টন	১৪০ টন	৮৫ টন	৮০ টন	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
প্রোলিন	৮০ টন	৮০ টন	৭০ টন	৮৫ টন	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়
দেবগিরি	১১৫ টন	১১০ টন	১০৫ টন	৭০ টন	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়
সাফাল সুদান	৭০ টন	৭০ টন	৫৫ টন	১০৫ টন	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়
মিকু জাম্বু	১০০ টন	১০০ টন	৯০ টন	১০৫ টন	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়
হোয়াইট সিড	৬০ টন	৯০ টন	৮৫ টন	৬০ টন	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়

আমিষের পরিমান

আমিষ হচ্ছে খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা প্রাণীর দেহকলা বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রাখে। উদ্ভিদের চেয়ে প্রাণীজ উৎসে প্রোটিনের পরিমান এবং গুণগত মান বেশী থাকে। আবার উদ্ভিজ উৎসের মধ্যে রাফেজ (আঁশজাতীয়) খাদ্যের চেয়ে দানাদার খাদ্যে প্রোটিন বেশী থাকে সেজন্য দানাদার খাদ্যের মূল্য বেশী। শুধু তাই না, যে সমস্থ দানাদার খাদ্যে প্রোটিন বেশী সেই দানাদার খাদ্যের মূল্যও বেশী। বিএলআরআই এ উল্লেখিত ছয়টি জাম্বু ঘাসের ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রোটিনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নের ৪.২ নং টেবিলে দেয়া হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত চারটি হার্ভেস্ট পিরিওডের অধিকাংশ সময়ই প্রোটিনের পরিমান সুইট জাম্বু ঘাসে বেশী। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, হার্ভেস্ট পিরিওড যতই বাড়তে থাকে সকল ঘাসের প্রোটিনের মান ততই কমতে থাকে এবং এই কমার মাত্রাটা দেবগিরি ও হোয়াইট সিড জাম্বু ঘাস বাদে বাকী চারটি ঘাসেই তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং পুষ্টির গুণাগুন বিবেচনায় সুইট জাম্বু ঘাসই সবচেয়ে ভাল এবং সেটি যত তাড়াতাড়ি হার্ভেস্ট করা যাবে তত বেশী প্রোটিন পাওয়া যাবে।

টেবিল ৪.২ঃ বিভিন্ন জাম্বু কালটিভারের বিভিন্ন পর্যায়ে আমিষের শতকরা পরিমান (%)

কালটিভারের নাম	রোপনের পরে গাছের বয়স (উৎপাদনের পর্যায়)				মন্তব্য
	৪৫ দিন	৬০ দিন	৭৫ দিন	৯০ দিন	
সুইট জাম্বু	১৫.৫%	১৪.৩%	১৪.১%	১৩.২%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
প্রোলিন	১৫.২%	১৩.১%	১২.৭%	১২.৯%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
দেবগিরি	১৪.৯%	১৩.৬%	১২.৭%	১২.১%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়
সাফাল সুদান	১৫.৮%	১৩.২%	১৩.০%	১২.৫%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
মিকু জাম্বু	১৫.১%	১৩.৪%	১৩.২%	১২.৬%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
হোয়াইট সিড	১৫.২%	১৩.৭%	১৩.৫%	১৩.৫%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়

এসিড ডিটারজেন্ট ফাইবার (এডিএফ)

বিএলআরআই এ ছয় প্রকারের জাম্বু ঘাসের এডিএফ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সেগুলোতে এডিএফের পরিমানে খুব একটা তারতম্য নেই, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই যে সকল ঘাসেই হার্ভেস্ট পিরিওড (ফসল কাটার সময়) বাড়ার সাথে সাথে এডিএফের মাত্রাও তাৎপর্যপূর্ণ ভবে বাড়তে থাকে (৪.৩নং টেবিল)। সুতরাং, গবাদী পশুর অধিক পরিপাচ্য শক্তি নিশ্চিৎ করতে পরিপক্ক জাম্বু ঘাসের চেয়ে অপরিপক্ক কিংবা কম পরিপক্ক ঘাসই খাওয়ানো উচিৎ।

টেবিল ৪.৩ঃ বিভিন্ন জাম্বু কালটিভারের বিভিন্ন পর্যায়ে এসিড ডিটারজেন্ট ফাইবারের শতকরা পরিমান (%)

কালটিভারের নাম	রোপনের পরে গাছের বয়স (উৎপাদনের পর্যায়)				মন্তব্য
	৪৫ দিন	৬০ দিন	৭৫ দিন	৯০ দিন	
সুইট জাম্বু	২৪.৮%	৩১.১%	৩৬.২%	৩৯.৬%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
প্রোলিন	২৫.৯%	৩১.৭%	৩৭.৩%	৩৮.০%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
দেবগিরি	২৪.৮%	৩০.৯%	৩৭.৮%	৩৯.৭%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
সাফাল সুদান	২৫.৫%	৩০.২%	৩৮.৫%	৩৯.৬%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
মিকু জাম্বু	২৫.০%	৩০.৩%	৩৯.৭%	৪০.৪%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
হোয়াইট সিড	২৪.৮%	৩০.১%	৩৬.৪%	৩৮.৭%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ

নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবার (এনডিএফ)

বিএলআরআই কর্তৃক গবেষণাকৃত জাম্বুর ছয়টি কালটিভারের এনডিএফের তুলনামূলক নিম্নের ৪.৪নং টেবিলে দেয়া আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন হার্ভেস্ট পিরিওডে ছয়টি কালটিভারের মধ্যে এনডিএফের পরিমানে খুব একটা তারতম্য নেই। তবে, সকল কালটিভারের ক্ষেত্রেই হার্ভেস্ট পিরিওড বাড়ার সাথে সাথে এনডিএফের পরিমান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়তে থাকে। সুতরাং জাম্বু ঘাসের গুণগত মান ভাল পেতে যত অল্প সময়ে ঘাস হার্ভেস্ট করা যাবে ততই ভাল।

টেবিল ৪.৪ঃ বিভিন্ন জাম্বু কালটিভারের বিভিন্ন পর্যায়ে নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ফাইবারের শতকরা পরিমান (%)

কালটিভারের নাম	রোপনের পরে গাছের বয়স (উৎপাদনের পর্যায়)				মন্তব্য
	৪৫ দিন	৬০ দিন	৭৫ দিন	৯০ দিন	
সুইট জাম্বু	২৯.০%	৩৪.৭%	৪০.০%	৪০.০%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
প্রোলিন	২৯.৫%	৩৪.৬%	৩৯.৮%	৪১.২%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
সেবগিরি	২৮.৯%	৩৪.৯%	৪০.৫%	৪১.২%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
সাফাল সুদান	২৯.৩%	৩৪.৭%	৩৮.৮%	৩৯.২%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
মিকু জাম্বু	২৮.৬%	৩৪.৫%	৩৮.৫%	৩৮.৮%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
হোয়াইট সিড	২৯.০%	৩৪.৬%	৩৮.৭%	৪২.৫%	উৎপাদনের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ

মোট খাদ্য গ্রহন

নিম্নের ৫নং টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, বিএলআরআই এ গবেষণাকৃত দুটি ঘাসের সাইলেজের মধ্যে জাম্বু ঘাসের সাইলেজের শুষ্ক পদার্থই পশু বেশী গ্রহন করেছে। গ্রহনকৃত জাম্বু ও নেপিয়ার সাইলেজের শুষ্ক পদার্থের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ। এমনকি জাম্বু ঘাসের সাইলেজ কর্তৃক গ্রহনকৃত প্রোটিনের পরিমানও নেপিয়ার সাইলেজ কর্তৃক গ্রহনকৃত প্রোটিনের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেশী। কিন্তু জাম্বু ঘাসের সাইলেজ কর্তৃক গ্রহণকৃত জৈব পদার্থের পরিমান নেপিয়ার সাইলেজ কর্তৃক গ্রহনকৃত জৈব পদার্থের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কম।

পরিপাচ্যতা

বিএলআরআই কর্তৃক গবেষণার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, জাম্বু ঘাসের সাইলেজের জৈব অংশের পরিপাচ্যতা অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পরিপাচ্যতার তুলনায় বেশী যা প্রায় ৯২-৯৩ ভাগ (৫নং টেবিল)। আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, জাম্বু ও নেপিয়ার ঘাসের সাইলেজের বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিপাচ্যতার তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রোটিন এবং এডিএফের পরিপাচ্যতা নেপিয়ার সাইলেজের চেয়ে জাম্বু সাইলেজে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বেশী। আবার অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের পরিপাচ্যতার পার্থক্য উক্ত দুটি সাইলেজের ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে (৪.৫নং টেবিল)। যেহেতু প্রোটিন একটি অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান এবং জাম্বু সাইলেজে সেটির পরিপাচ্যতা বেশী তাই জাম্বু ঘাসের সাইলেজ খামারীদের জন্য উত্তম।

টেবিল ৪.৫ঃ গবাদী পশু কর্তৃক জাম্বু ও নেপিয়ার ঘাসের সাইলেজের মোট খাদ্য গ্রহন এবং বিভিন্ন পুষ্টিমানের পরিপাচ্যতার তুলনামূলক চিত্র

গুণাগুন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্যারামিটার/নির্দেশক	জাম্বু ঘাসের সাইলেজ	নেপিয়ার ঘাসের সাইলেজ	দুটি সাইলেজের গুণগত পার্থক্য
সাইলেজের শুষ্ক পদার্থ গ্রহন (কেজি/দিন)	৪.৬৩	৪.৪৭	পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
জৈব পদার্থ গ্রহন (কেজি/দিন)	৩.৯৮	৪.০৯	পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
অশোধিত প্রোটিন গ্রহন (গ্রাম/দিন)	৫০৫.৫৫	৩৭৯.৩০	পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
শুষ্ক পদার্থের পরিপাচ্যতা (%)	৫৩.০৮	৫১.২১	পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়
জৈব পদার্থের পরিপাচ্যতা (%)	৯২.৫১	৯১.২৯	পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়
অশোধিত প্রোটিনের পরিপাচ্যতা (%)	৬৪.৭৩	৫৯.৫২	পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ
এনডিএফের পরিপাচ্যতা (%)	৬৩.৫০	৬১.৮৩	পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়
এডিএফের পরিপাচ্যতা (%)	৭২.৭১	৬৬.১৩	পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ

আয়-ব্যয়ের হিসাবঃ

টেবিলে ৪.৬ এ জাম্বু চাষের আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব দেখানো হল-

টেবিল ৪.৬ঃ ব্যবসায়িকভাবে চরে জাম্বু গ্রাস ঘাস চাষের আয় ও ব্যয়ের হিসাব (জমির পরিমান ৩৩ শতক)

ব্যয়ের হিসাব		আয়ের হিসাব			
ব্যয়ের ধরন	মুল্য (টাকা)	আয়ের উৎস	উৎপাদন (কেজি)	বিক্রয় মূল্য/কেজি	মোট মুল্য (টাকা)
জমি প্রস্তুত করা	২৩১০/-	১ম কাটিং	১৮০০	৩	৫৪০০/-
জমি লিজ	৪০০০/-	২য় কাটিং	২১০০	৩	৬৩০০/-
বীজ	৭৫০/-	৩য় কাটিং	২৪০০	৩	৭২০০/-
সার প্রয়োগ	২০০০/-	৪র্থ কাটিং	২৪০০	৩	৭২০০/-
সেচ	১২০০/-	৫ম কাটিং	২৪০০	৩	৭২০০/-
নিড়ানী	১৫০০/-	৬ষ্ঠ কাটিং	১৮০০	৩	৫৪০০/-
বেড়া	১০০০/-				
অন্যান্য	৬০০/-				
মোট ব্যয়	**১৩৩৬০/-**	**মোট আয়**	**১২৯০০**	**৩**	**৩৮৭০০/-**

মোট আয় = ৩৮,৭০০ টাকা

মোট ব্যয় = ১৩,৩৬০ টাকা

নিট লাভ = ২৫,৩৪০ টাকা। সুতরাং, একজন কৃষক ১ বিঘা জমি থেকে বছরে প্রায় ২৫,০০০ টাকা নেট লাভ করতে পারে।

নেপিয়ার ঘাসের চাষাবাদ প্রণালী

নেপিয়ার ঘাসের পরিচিতি

নেপিয়ার বা এলিফ্যান্ট গ্রাস গ্রীষ্ম প্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের একটি বহুবর্ষীয় ফডার উদ্ভিদ যা শীত ও গ্রীষ্ম উভয় মৌসুম এবং দোঁ-আশ বা বেলে দোঁ-আশ মাটিতে ভাল হয়। এমনকি শুষ্ক খরা অঞ্চলেও এটি উৎপাদন করা যায়। তবে জলাবদ্ধ কিংবা বন্যাপ্রবণ ভূমিতে এটি টেকেনা। এটি সারা বছরই চাষ করা যায় যদিও শীতকালে এর বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হয়। এর ভেটিটেটিভ/ফলিয়েজ (অধিক পাতা সমৃদ্ধ) বৃদ্ধি অন্যান্য ঘাসের তুলনায় অধিক যা গবাদিপশুর সবুজ ঘাসের চাহিদা পূরণে ব্যাপক হারে চাষাবাদ হচ্ছে।

জমি প্রস্তুতি

জমি প্রস্তুতির শুরুতেই জমির জঙ্গল, কাঁটা, আগাছা সহ অন্যান্য অপদ্রব্য দূর করে ২-৩ বার ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে মই দ্বারা সমান করে জমির ঢালের (যদি থাকে) বিপরীতে ২ ফুট পর পর ৮-১০ ইঞ্চি উঁচু আইল তৈরী করে নিতে হবে যাতে সহজ ও সুষমভাবে জমিতে সেচ কার্য প্রদান করা যায়। তবে আইল তৈরীর পূর্বেই জমি চাষের সময় ব্যাজাল (প্রাথমিক) জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। জমির অবস্থা ভেদে একর প্রতি ১০ মেট্রিক টন গোবর বা অন্যান্য জৈবসার (কম্পোস্ট/স্লারি) প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়াও মাটির নমুনা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রয়োজন মত অজৈব সার (ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম ফসফেট/টিএসপি, এমপি ইত্যাদি) প্রদান করতে হবে। পরিত্যাক্ত জমিতে সাধারনত একর প্রতি ৩০:২০:১৫ কেজি হারে এনপিকে (নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম) সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও ঘাস লাগানোর ৩০ দিন পর (টপ ড্রেসিং) একর প্রতি ৩০ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার ঘাস কাটার পরেও টপ ড্রেসিং মাত্রার নাইট্রোজেন সার প্রদান করতে হবে। অথবা জমির বিভিন্ন একক পরিমান অনুযায়ী নিম্নলিখিত ৪.৭ নং সারণী অনুসরন করা যেতে পারেঃ

সারণী ৪.৭ঃ নেপিয়ার চাষে বিভিন্ন আকারের জমিতে বিভিন্ন প্রকার সার প্রদানের মাত্রা

সার প্রয়োগের সময়	সারের প্রকার	প্রতি একক জমিতে সারের পরিমাণ			
		হেক্টর প্রতি	বিঘা প্রতি	শতাংশ প্রতি	কাটিং প্রতি
জমি চাষ দেয়ার সময় (ব্যাজাল)	জৈবসার# ইউরিয়া ডিএপি/টিএসপি এমপি	১৫-২৫ মে.টন ৭৫ কেজি ২৫ কেজি ২০ কেজি	২-৩ মে.টন ১০ কেজি ৩.৫ কেজি ২.৭ কেজি	৬০-১০০ কেজি ৩০০ গ্রাম ১০০ গ্রাম ৮০ গ্রাম	০.৭৫ কেজি ২.২৫ গ্রাম ০.৭৫ গ্রাম ০.৬ গ্রাম
কার্টিং লাগানোর ৩০ দিন পর (টপ ড্রেসিং)	ইউরিয়া *ডিএপি/টিএসপি এমপি	৭৫ কেজি ২৫ কেজি ২০ কেজি	১০ কেজি ৩.৫ কেজি ২.৭ কেজি	৩০০ গ্রাম ১০০ গ্রাম ৮০ গ্রাম	২.২৫ গ্রাম ০.৭৫ গ্রাম ০.৬ গ্রাম
প্রত্যেকবার ফসল কাটার পর পর (৪০-৫০ দিন পর পর)	ইউরিয়া	১০০ কেজি	১৩.২৫ কেজি	৪০০ গ্রাম	৩.০ গ্রাম
১ বছর পর পর	ডিএপি/টিএসপি এমপি	৫০ কেজি ৪০ কেজি	৭ কেজি ৫.৫ কেজি	২০০ গ্রাম ১৬০ গ্রাম	১.৫ গ্রাম ১.২৫ গ্রাম

কার্টিং সংগ্রহ ও প্রস্তুতি

নেপিয়ার হাইব্রীড ফডার লাগানোর জন্য হয় রুট স্ট্রীপ কিংবা স্টেম কাটিং এর প্রয়োজন হয়। যাদের নিজস্ব জমিতে নেপিয়ার লাগানো আছে তারা নিজেরাই ইহা সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে অন্য জমিতে লাগাতে পারে, কিংবা অন্য কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করেও লাগাতে পারে। ৩-৪ মাস বয়সী নেপিয়ার গাছের মধ্যম পরিপূর্ণ কান্ডের মাঝের অংশই উত্তম কাটিং যা লাগালে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এরকম বয়সী গাছের প্রতিটা টিলার (কান্ড) থেকে আগা এবং গোঁড়া কেটে ফেলে মধ্যম অংশের প্রতি ২টি গিড়া পর পর এঙ্গেল করে কেটে কাটিং তৈরী করে নিতে হবে। এভাবে কেটে কেটে প্রস্তুতকৃত কাটিং ২-৩ দিন পরেও রোপণ করা যায়। আবার ভেজা স্যাঁতসেঁতে জায়গা বা ভেজা ছালায় রেখে বা পানি ছিটিয়ে রাখলে ৫-৭ দিন পরেও রোপণ করা যায়। সাধারনতঃ প্রতি শতাংশে জমিতে ১৫০-১৬০ টি (বিঘায় ৫০০০ টি) কাটিং লাগে।

কাটিং রোপণ

সাধারণত একটা কাটিং থেকে আর একটি কাটিং ৫০-৬০ সে.মি. (বা ১.৫-২.০ ফুট) দূরত্বে রোপণ করতে হয়। আইলে নির্দিষ্ট দূরত্বে কাটিং রোপণ করার সময় কাটিং ভূমির একই দিকে কাত করে (৪৫°) এর গোড়ার মাটি ভালভাবে লেবে দিতে হবে। প্রতি কাটিং এ দুটি গিড়ার মধ্যে একটি মাটির ভেতরে (যেখান থেকে রুট এবং সুট গজাবে) এবং অপরটি মাটির উপরে (যেখান থেকে কেবল সুট গজাবে) থাকবে। আর যদি আইল ছাড়া সমান জমিতে কাটিং রোপণ করা হয় তবে পুরো জমি ভালভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে হাল্কা কাঁদার মত করে নির্দিষ্ট দূরত্বে দ্রুত কার্টিং রোপন করা যায়। কাটিং রোপণ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে গিড়ার অগ্রমূখী (পাতা গজানোর দিক) উপরের দিকে থাকে।

সেচ ও নিষ্কাশন

বর্ষাকালে জমিতে যাতে পানি জমে না থাকে সেজন্য ভাল নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রথমবার জমিতে পানি দিতে হবে কাটিং লাগানোর পরপরই (জমি ভিজিয়েও কাটিং লাগানো যায়), এরপর লাগানোর ৩ দিন পর সেচ প্রদান করতে হবে। পরবর্তি সেচগুলো মাটির আর্দ্রতা বা বৃষ্টিপাত ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে দিতে হবে। তবে সাধারণতঃ মাটির গুণগত অবস্থাভেদে ৭-১০ দিন পর পর সেচ প্রদান করতে হবে।

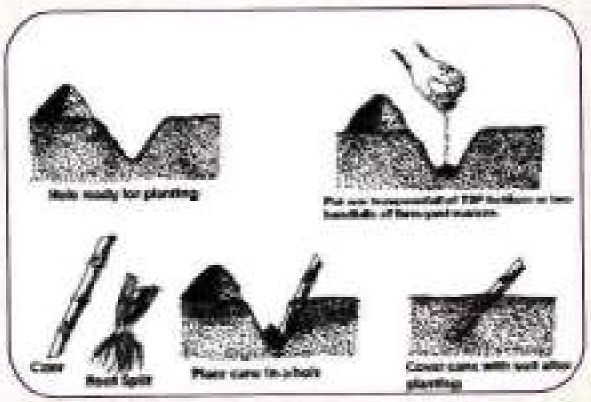

আগাছা দমন

কাটিং লাগানোর ৩০ দিনের মধ্যে প্রথমবার হাত দ্বারা আগাছা দমন করতে হবে। এরপর দ্বিতীয়বার আগাছা দমন তখনই প্রয়োজন যদি জমিতে খুব বেশি পরিমানে আগাছা বৃদ্ধি পায়।

ফসল কাটা ও পরবর্তি ব্যবস্থাপনা

প্রথমবার ফসল (ঘাস) কাটা যাবে কাটিং লাগানোর ২ মাস থেকে ২.৫ মাস পরে। পরবর্তিতে জমির উর্বরতা, ঋতু ও ফসল ব্যবস্থাপনা ভেদে ১ মাস থেকে ১.৫ মাস পর পর ঘাস কাটা যাবে অথবা যখন ঘাসের উচ্চতা হবে প্রায় ৫ ফুটের মত। এভাবে বৎসরে সর্বমোট ৬ থেকে ৮ বার ফসল কর্তন করা সম্ভব। গাছের ছোবড়া (টিলার) বেশি পরিমানে ছড়ানোর জন্য জমির একেবারে কাছাকাছি গাছের গোড়া থেকে ফসল কেটে ফেলতে হবে। প্রতিবার ফসল কাটার পরে পূণরায় আগাছা দমন, শক্ত হয়ে যাওয়া মাটি আলগা করে আঁচড়িয়ে নরম ও টপ ড্রেসিং বা বর্ণিত মাত্রায় সার প্রদান (বিঘা প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন সার বা ইউরিয়া) করে জমিতে পানি বা সেচ প্রদান করতে হবে।

ফলন ও পুষ্টিমান

একটি পরিপূর্ণ নেপিয়ার গাছের উচ্চতা প্রায় ৯-১২ ফুট, প্রতি গুচ্ছে (ক্লাম্প) কাঠির (টিলার) সংখ্যা ৩০-৪০টি এবং মোট পাতার সংখ্যা ৪০০-৪৫০টি। যদি একক ফসল হিসাবে জমিতে শুধুমাত্র নেপিয়ার হাইব্রীড ফডার চাষ করা হয় তবে প্রতিবার কর্তনে ফলন বিঘা প্রতি গড়ে প্রায় ৪-৮ মেট্রিক টন এবং বছরে প্রায় ৩০-৫০ মেট্রিক টন (হেক্টর প্রতি বছরে ২৫০-৩৭০ মেট্রিক টন প্রায়)। ইন্টারক্রপ হিসাবে কলা, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের ফাঁকেও নেপিয়ার হাইব্রীড চাষ করা যায়। নেপিয়ার হাইব্রীড সম্পূর্ণ গাছে শুষ্ক পদার্থ শতকরা ১৫-১৮ ভাগ, ক্রুড (অশোধিত) প্রোটিন শতকরা ৮-১০ ভাগ (যা শুধু পাতায় ২০-২৫ ভাগ) এবং রোমন্থণ প্রাণিতে এর পরিপাচ্যতা প্রায় ৫৫-৬০ ভাগ। তবে গাছের বয়স, ঋতু, মাটির ধরন ভেদে পুষ্টিমানে সামান্য তারতম্য হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, মোটামুটি মানের ব্যবস্থাপনায় একটি হিল/ক্লাম্প (পুরো গাছের ছোবড়া) থেকে ৩০-৪৫ দিন পর পর ৫ কেজির মত সবুজ ঘাস (বায়োমাস) পাওয়া যেতে পারে।

স্থায়ীত্ব

যেহেতু নেপিয়ার হাইব্রীড একটি বহুবর্ষী উদ্ভিদ তাই এর রুট স্লীপ (শেকড়ের খন্ড) বা স্টেম কাটিং (কান্ডের টুকরা) একবার জমিতে লাগালে বহুবৎসর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। তবে প্রথম ২-৩ বৎসরে যা ফলন পাওয়া যাবে তা পরবর্তিতে আস্তে আস্তে কমে যায়, বিধায় ২-৩ বৎসর পর ঐ জমিতে পূণরায় নতুন কাটিং লাগিয়ে উৎপাদন করাই সর্বোত্তম।

আয়-ব্যয় বিশ্লেষণঃ নেপিয়ার চাষে আয়-ব্যায়ের যাবতীয় হিসাব টেবিল ৪.৮ এ দেখানো হ'ল-

আয়-ব্যয়ের হিসাব

টেবিল ৪.৮ঃ বাণিজ্যিকভাবে নেপিয়ার ঘাস চাষের আয় ও ব্যয়ের হিসাব (জমির পরিমান ৩৩ শতক)

ব্যয়ের হিসাব		আয়ের হিসাব			
ব্যয়ের ধরন	মুল্য (টাকা)	আয়ের উৎস	উৎপাদন (কেজি)	বিক্রয় মূল্য/কেজি	মোট মুল্য (টাকা)
জমি লিজ	১০,০০০/-	১ম কাটিং	৬৫০০	২.৫	১৬,২৫০/-
জমি প্রস্তুত (চাষ ও আইল)	৫,০০০/-	২য় কাটিং	৮০০০	২.৫	২০,০০০/-
কাটিং ক্রয়	৫০০/-	৩য় কাটিং	৯০০০	২.৫	২২,৫০০/-
সার প্রয়োগ	৫,০০০/-	৪য় কাটিং	৮০০০	২.৫	২০,০০০/-
সেচ ও নিড়ানী	৫,০০০/-	৫ম কাটিং	৭০০০	২.৫	১৭,৫০০/-
অন্যান্য (বেড়া, কৃষি যন্ত্রপাতি, পরিবহন ইত্যাদি)	২,৫০০/-	৬ষ্ট কাটিং	৬০০০	২.৫	১৫,০০০/-
মোট ব্যয়	২৮,০০০/-	মোট আয়	৪৪,৫০০/-	২.৫	১,১১,২৫০/-

মোট আয় = ১,১১,২৫০/- টাকা
মোট ব্যয় = ২৮,০০০/- টাকা
নিট লাভ = ৮৩,২৫০/- টাকা। সুতরাং, একজন কৃষক ১ বিঘা জমি থেকে বছরে প্রায় ৮০,০০০/- টাকা নেট লাভ করতে পারে।

মেহেরপুর জেলায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ঘাস পরিবহন

বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত ঘাস বিক্রয়

মডিউল-৫
গবাদি প্রাণীর খাদ্য উপাদান, শ্রেণী বিন্যাস এবং রেশন প্রস্তুতকরণ

আলোচিত বিষয় সমূহঃ

৫.১. খাদ্য উপাদান, শ্রেণীবিন্যাস ও রেশন প্রস্তুকরণ সমন্ধে পরিচিতি

২.২. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পাবে:

- প্রাণী খাদ্য উপাদান ও তাদের কাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- খাদ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও প্রাণী খাদ্যে এদের ভূমিকা সমন্ধে জানতে পারবে।
- খাদ্যের শ্রেণীবিন্যাস, গবাদি প্রাণীর উৎপাদন দক্ষতা ভিত্তিক রেশন প্রস্তুতকরণ সমন্ধে ধারণা পাবে।
- মাটির ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত ফডার বাছাই সম্পর্কে ধারণা পাবে।

২.৩ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব

- প্রশিক্ষক খামারিদের নিজস্ব এলাকায় সহজপ্রাপ্য খাদ্যের একটি তালিকা তাদের কাছ থেকে চাইতে পারেন এবং খাদ্যোপাদান গুলোকে পুষ্টির উৎস অনুসারে পৃথক করতে বলতে পারেন।
- খামারীদের দেয়া সহজপ্রাপ্য খাদ্য তালিকা দিয়ে প্রশিক্ষক খামারীদের ষাঁড় গরুর জন্য (মোটাতাজাকরণ) একটি সুষম রেশন প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট ওজনের একটি ষাঁড় গরুকে দৈনিক রেশন প্রদানের পরিমানের হিসাব চাইতে পারেন।
- অনুরুপভাবে তিনি গাভির জন্য একটি সুষম রশদ তৈরী এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ উৎপাদনশীল একটি গাভীকে প্রত্যহ কতটুকু রেশন প্রদান করতে হবে তাও খামারীদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারেন।

৫.১ ঃ খাদ্যের শ্রেণীবিন্যাস

খাদ্যকে বিশ্লেষণ করলে ভিন্ন ভিন্ন গুণ সম্পন্ন পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেককে এক একটি পুষ্টি উপাদান বলে। খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ৬টি যথা-

(১) শ্বেতসার বা শর্করা

(২) আমিষ/প্রেটিন

(৩) স্নেহ বা চর্বি

(৪) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

(৫) খনিজ ও

(৬) পানি

(১) শ্বেতসার বা শর্করা ঃ যে পুষ্টি উপাদান প্রাণীদেহে শক্তির যোগান দেয় তাকে শ্বেতসার জাতীয় পুষ্টি উপাদান বলে। অতিরিক্ত শ্বেতসার শরীরে চর্বি হিসেবে জমা হয়। যেমন: চালের কুড়া, গমের ভূষি, সকল ঘাস ও খড় জাতীয় খাদ্য।

কাজ ঃ

(ক) শরীরে শক্তি যোগান দেয়।

(খ) চর্বির উৎস হিসেবে কাজ করে। শরীরে শক্তির যোগান দেয়ার পরও অতিরিক্ত শ্বেতসার চর্বি হিসেবে জমা হয়।

(২) আমিষ ঃ যে সকল পুষ্টি উপাদান শরীরে মাংস বৃদ্ধির কাজ করে তাকে আমিষ জাতীয় পুষ্টি উপাদান বলে। ইহা বিভিন্ন ধরণের এ্যামাইনো এসিড এর সমন্বয়ে গঠিত। সব ধরনের খৈল, ডালের ভূষি, সয়াবিন মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেট, ফিস মিল প্রভৃতি।

কাজ ঃ

(ক) ইহা শরীরে নতুন কোষ তৈরী করে।

(খ) পুরাতন ও ভেঙ্গে যাওয়া কোষকে পুনঃ গঠনে সাহায্য করে।

(গ) শিং, নখ, চুল, পশম, ক্ষুর ইত্যাদি গঠন এবং বৃদ্ধির জন্য আমিষ অপরিহার্য।

(ঘ) ইহা শরীরে পাচ্যরস, হরমোন এবং রক্তে লোহিত কনিকা তৈরী করে।

(ঙ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমিষ শরীরে শক্তিও যোগান দেয়।

(চ) দুধের আমিষ উপাদান সংশ্লেষণে সহায়তা করে এবং দুধ উৎপাদনে সক্রিয় অংশ নেয়। ইহা বেশী হলেও দুধ কমে যায়।

(৩) ফ্যাট বা চর্বি ঃ ফ্যাটি এসিডের সমন্বয়ে গঠিত এমন উপাদান যা কিনা শ্বেতসার এবং আমিষের চাইতে ২.২৫ গুন বেশী শক্তি দিয়ে থাকে। যেখানে এক গ্রাম শ্বেতসার চার ক্যালোরী শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা রাখে, সেখানে এক গ্রাম চর্বির শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৯ (নয়) ক্যালোরী। যেমন: সব ধরনের খৈল, সয়াবিন মিল, যে কোন ধরনের তেল প্রভৃতি।

কাজ ঃ

(ক) ইহা শরীরে শক্তির যোগান দেয়।

(খ) শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে।

(গ) দেহে সঞ্চিত খাদ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে। ইহা শর্করা ও আমিষের চাইতে ২.২৫ গুন বেশী শক্তি দিয়ে থাকে।

(ঘ) ইহা পশু পাখীর পশম ও পালকের উপর চর্বির আস্তরন দিয়ে থাকে।

(ঙ) চর্বি মাংসের পুষ্টিমান বাড়ায় এবং সুস্বাদু করে তোলে।

(৪) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ঃ ইহা শরীরে খুবই অল্প পরিমাণে দরকার হয় এবং ইহার অভাবে শরীরে অপুষ্টি জনিত রোগ দেখা দেয়। গবাদি পশুর জন্য ভিটামিন এর প্রয়োজন হয় না। কারণ দেহেই ভিটামিন সংশ্লেষন হয়ে থাকে। শুধুমাত্র হাঁসমুরগীর জন্য আলাদা ভাবে দিতে হয়।

ভিটামিন দু'প্রকারঃ যথা

(ক) চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন যেমনঃ ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে এবং

(খ) পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন যেমনঃ ভিটামিন সি ।

উৎস ঃ ফলমূল, শাকসবজি, প্রাণীর কলিজা, ডিম ও দুধ ।

(৫) খনিজ ঃ অজৈব পদার্থ সমূহই খনিজ উপাদান । যেমনঃ ডিসিপি, লবন, হকের গুড়া ইত্যাদি ।

কাজ ঃ

(ক) ইহা দেহের অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে ।

(খ) ইহা দেহের অস্থি কাঠামো, ডিমের খোসা ও খনিজ অংশ, দুধের খনিজ অংশ ইত্যাদি গঠন করে ।

(গ) হজমে সহায়তা করে ।

উৎস:- হাঁড়ের গুড়ো, মাছের গুড়ো, আয়োডিন, লবণ, চুনা পাথর, চক এর গুড়ো রক্তের গুড়ো, তাল জাতীয় ঘাস, মাখন তোলা দুধের গুড়ো ।

প্রাণিদেহে লবনের প্রয়োজনীয়তা

(ক) লবণ খাদ্যের স্বাদ বাড়ায় ।

(খ) মুখ হতে লালা নিঃস্বরনে সহায়তা করে ।

(গ) দেহে রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে ।

(ঘ) খাদ্য বস্তু হজমে সহায়তা করে ।

(ঙ) সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে যেমন চামড়া, মাখন, পণির ইত্যাদি ।

(৬) পানি ঃ ইহাও খাদ্যের একটি উপাদান । প্রাণী দুটো উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকে । একটি হচ্ছে সরাসরি পানি পানের মাধ্যমে, আর একটি হচ্ছে মেটাবলিক পানি যা খাদ্য বিপাকের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরে তৈরী হয়ে তাকে ।

কাজ ঃ

(ক) শারীরিক কোষের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করে ।

(খ) পানি খাদ্যের বাহক হিসেবে কাজ করে ।

(গ) ইহা হজমে সহায়তা করে ।

(ঘ) শারীরিক কোষের অভিস্রবণীয় (osmotic) চাপ রক্ষা করে ।

(ঙ) দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে ।

(চ) ইহা খাদ্যকে দ্রবীভূত করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খাদ্যকে দেহে শোষনে সাহায্য করে ।

আমিষের অভাব জনিত উপসর্গ

(ক) গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে । কেননা দুধে অন্ততঃ ২-৩.৫ % আমিষ থাকে । তাই খাদ্যে তথা দেহে আমিষ অভাব হলে দুধ উৎপাদন অবশ্যই কমে যাবে ।

(খ) দেহে মাংসের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং শীর্ণ হয়ে যাবে ।

(গ) পশম বা চুল উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং পশম বা চুলের পরিমাণ কমতে থাকবে ।

(ঘ) হাঁস-মুরগীর ডিম উৎপাদন ক্ষমতা কমবে এবং দেহের ওজন হ্রাস পাবে ।

(ঙ) শ্রমে নিয়োজিত পশুর (হালের বলদ, গাড়ীর গরু) কার্য ক্ষমতা কমে যাবে ।

(চ) রক্তহীনতা দেখা দেবে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে ।

(ছ) বংশ বৃদ্ধি ক্ষমতা হ্রাস পাবে ।

খনিজের অভাব জনিত উপসর্গ

খনিজ দ্রব্যের অভাব প্রাণীদেহে নানা উপসর্গ বা রোগ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে, প্রধান প্রধান ক'টি খনিজ দ্রব্যের অভাবজনিত উপসর্গের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

(ক) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে অস্থি বা হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। কোন কোন সময় অস্থি বেঁকেও যেতে পারে। দেহে ৪৯% ক্যালসিয়াম, ২৭% ফসফরাস এবং ২৪% অন্যান্য খনিজ পদার্থ থাকে।

(খ) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে গিট ফুলে যায়। পাঁজরের হাড় বাঁকা হয়ে যায়।

(গ) রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে রক্ত ক্ষরণের পর রক্ত জমাট বাঁধে না। দুধের গাভীর প্রসবের পর ক্যালসিয়ামের খুব বেশী অভাব হলে শরীরে কাঁপন দিয়ে জ্বর আসে। এ জ্বরকে "মিল্ক ফিভার" (Milk fever) বলা হয়।

(ঘ) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হলে মুরগীর ডিমের খোসা খুব পাতলা হয়, ফলে ডিম নরম হয়।

(ঙ) ম্যাগনেসিয়ামের চরম অভাবে শরীর কাঁপতে থাকে। দেখে মনে হয় ধনুস্টংকার হয়েছে। এ লক্ষণকে গ্রাস টিটানী (Grass tetany) বলে।

(চ) পটাশিয়ামের অভাবে প্রাণী পেশীর বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলে।

(ছ) লোহার অভাব হলে রক্তহীনতা দেখা দেয়।

(জ) কোন কোন দেশে যেমন, অস্ট্রেলিয়ায় গো-খাদ্যে তামার অভাব হলে এমন দুরাবস্থা হয় যে পশু হঠাৎ পড়ে গিয়ে চিকিৎসার কোন সুযোগ না দিয়েই মারা যায়।

(ঝ) খাদ্যে আয়োডিনের অভাবে ক্ষুধামন্দা রোগ দেখা দেয়।

(ঞ) সোডিয়ামের অভাবে ক্ষুধামন্দা রোগ দেখা দেয়।

(ট) ফসফরাসের অভাবে পুষ্টিহীনতা হয়।

(ঠ) জিংকের অভাবে টাক মাথার মত হয়ে পশম পড়ে যায় এবং চামড়া ফেটে কোন কোন সময় রক্ত বের হতে দেখা যায়।

(ড) কোবাল্ট এর অভাবে একদম হাড্ডিসার ও কংকালে পরিণত হতে দেখা যায়।

(ঢ) মলিবডিনাম এর অভাবে প্রথম নিষিক্তে (ovulation) বিলম্ব হতে পারে।

(ন) কপার এর অভাবে চুল বা পশমের স্বাভাবিক রং পরিবর্তন হয়ে কালো (Dark) রং হয়।

(ত) সেলিনিয়াম এর অভাবে শারীরিক বর্ধন, অপুষ্টি এবং হোয়াইট মাসল রোগ (White muscle disease) ও বয়স্ক পশুর প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

(থ) সালফার এর অভাবে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার ওজন কমে, দুর্বলতা, চোখ দিয়ে পানি পড়া, ঘোম (ঝিম) ধরে থাকা ও মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে।

৫.২ঃ রেশন প্রস্তুতকরণ

সাধারণত রেশন বা রসদ তিন পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে, যেমন-

১. মেটাবলাইজেবল কর্মশক্তি (ME system) পদ্ধতি (বৃটিশ পদ্ধতি)
২. সামগ্রিক পরিপাচ্য খাদ্য-পুষ্টি (TDN system) পদ্ধতি (আমেরিকান পদ্ধতি)
৩. থাউকা (Thumb rules/Ready and Rough method) পদ্ধতি।

রেশন বা রসদ চার প্রকার যথাঃ-

(ক) স্বাস্থ্য পালন/রক্ষণাবেক্ষণ রসদ (Maintenance Ration)ঃ একটি প্রাণী বা পশুর শুধু সাধারণ জীবন ধারণের নিমিত্তে যে পরিমাণ রসদের দরকার হয়, একে স্বাস্থ্য পালন রসদ বলে। ইহা সরাসরি উৎপাদনের জন্য দায়ী নয়।

(খ) উৎপাদন রসদ (Production Ration)ঃ গবাদি পশুর শরীর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত উপরন্তু দুধ, মাংস, কাজ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় রশদকে উৎপাদন রসদ বলে।

(গ) পুণরুৎপাদন/গর্ভধারণ রসদ (Pregnancy Ration)ঃ গর্ভধারণের শেষ কয়েক মাসে গর্ভে ভ্রূনের পুষ্টির জন্য শরীর রক্ষা বা উৎপাদন রসদের অতিরিক্ত যে খাদ্য সামগ্রীর দরকার হয়, একে গর্ভধারণ রসদ বলে।

(ঘ) সুষম রসদ (Balanced Ration)ঃ শরীর রক্ষা, গর্ভধারণ, উৎপাদন ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য পুষ্টির সমন্বয়ে গঠিত খাদ্য তালিকাকে সুষম রসদ বলা হয়।

মোটাতাজাকরণের সুষম রসদ

মোটাতাজাকরণের জন্য সুষম রেশনে পর্যাপ্ত পরিমাণ আমিষ, খাদ্য প্রাণ ও খনিজ সহকারে মোট পরিপাচ্য পুষ্টি উপাদান প্রদান যুক্তিযুক্ত। সাধারণভাবে এ সমস্ত উপাদান নিম্নলিখিত ভাবে পর্যায়ক্রমে প্রদান করা যায়

১. উন্নতমানের সকল প্রকার মোটা গো-খাদ্য খাওয়াতে হবে। এতে অপচয় হ্রাস পায়।

২. যে ধরণের মোটা গো-খাদ্য খাওয়ানো হবে তদানুসারে পরিপূরক দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ প্রদান করতে হবে।

৩. দৈনিক দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ব্যবহার করতে হবে।

৪. দানাদার খাদ্যে যথোপযুক্ত খনিজ মিশ্রণ প্রদান করতে হবে।

রসদের বৈশিষ্ট্য (Essential of a desirable dairy ration)

১. পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিপাচ্য আমিষ ও মোট পরিপাচ্য পুষ্টি উপাদান থাকবে।

২. রসালো খাবার সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু হবে।

৩. উচ্চমানের পরিপাচ্যতা হবে।

৪. অতিরিক্ত আঁশহীন পর্যাপ্ত আয়তনের হবে।

৫. পর্যাপ্ত পরিমাণ খনিজ সমৃদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাণ বিশিষ্ট হবে।

৬. দুধে সুগন্ধি আনয়নকারী হবে।

৭. দুর্গন্ধ পরিহারকারী (যেমন- পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি) হবে।

৮. সহজ লভ্য ও ব্যয় সাশ্রয়ী হবে।

সুষম রেশন তৈরীর ধারাবাহিক পদ্ধতি (Steps in calculating a balanced ration)

১. দৈনিক হিসেবে দেহরক্ষা এবং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিপাচ্য আমিষ ও মোট পরিপাচ্য পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

২. মোট গো-খাদ্য থেকে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদানের পরিমাণ হিসেব করতে হবে। (ব্যবহৃত গো-খাদ্যকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা উচিত নয়)

৩. দানা মিশ্রণ দ্বারা কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান সরবরাহ হবে এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

৪. একটি সুবিধাজনক দানা খাদ্যের মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। মিশ্রণটি সস্তা হতে হবে, বর্তমানে বাজারের দানা খাদ্য এবং আমিষ পরিপূরক দ্রব্যের মূল্যের ভিত্তিতে হতে হবে। যে খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান কম খরচে সরবরাহ করে তা ব্যবহার করাই উচিত।

৫. আমিষ পরিপূরক ব্যতীত মিশ্রণের পরিপাচ্য আমিষ (DP) এবং মোট পরিপাচ্য পুষ্টি (TDN) উপাদানের পরিমাণ হিসেব করতে হবে।

৬. টি, ডি, এন সরবরাহ করার জন্য কি পরিমাণ দানা খাদ্য প্রতিদিন প্রদান করতে হবে তা হিসেব করতে হবে।

৭. দানা মিশ্রণে প্রয়োজনীয় আমিষের শতকরা হার গণনা করতে হবে।

৮. উচ্চ আমিষ বিশিষ্ট খাদ্যের পরিমাণ হিসেব করতে হবে এবং মোট পরিপাচ্য পুষ্টি উপাদানের শতকরা হার নির্ণয় করতে হবে।

নিম্নে কিছু প্রচলিত ও অপ্রচলিত খাদ্যর খাওয়ানোর পদ্ধতি এবং প্রযুক্তির নাম ৫.১ নং সারণীতে বর্ণনা করা হল।

সারণী ৫.১ঃ প্রচলিত ও অপ্রচলিত খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি

ক্রমিক নং	আঁশ জাতীয় খাদ্যের নাম	পরিপাচ্যতার শতকরা হার	আমিষের মাত্রা (প্রতি ১০০ ভাগ শুষ্ক পদার্থে)	খাওয়ানোর পদ্ধতি
১.	ভুট্টা খড়	৪০-৫০	৭.০-৮.০	ছোট ছোট টুকরা অথবা চূর্ণ বিচূর্ণ করা এবং চিটাগুড় ব্যবহারে বা বাদে সংরক্ষণ করে অথবা সরাসরি খাওয়ানো যায়।
২.	আঁখের ডগা, পাতা এবং ছোবড়া	৪০-৫০	৫.০-৬.০	টুকরো টুকরো করে কাটার পর প্রতি ১০০ কিলোতে ১.০-১.৫০ কিলো ইউরিয়া মিশিয়ে খাওয়ানো অথবা সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনের সময় খাওয়ানো যেতে পারে।
৩.	কলা গাছ	৫০-৬০	৫.০-৬.০	তাজা কলাগাছ টুকরো টুকরো করে চিটাগুড় এবং শুকনো খড়ের সহিত সাইলেজ করে খাওয়ানো যেতে পারে।
৪.	দেশী সবুজ ঘাস	৪৫-৫০	৫.০-৬.০	সবুজ ঘাস সরাসরি খাওয়ানো, প্রতি ১০০ কিলো ঘাসে ৩-৫ কিলো চিটাগুড় মিশিয়ে সরাসরি খাওয়ানো অথবা চিটাগুড় মিশিয়ে সাইলেজ তৈরী করে খাওয়ানো যেতে পারে।
৫.	রেশম গাছের পাতা	৫০-৬০	১৮-২০	সরাসরি সবুজ অবস্থায় খড়ের সহিত ২ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে অথবা একই অনুপাতে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনের সময় খাওয়ানো।
৬.	ইপিল ইপিল/ধৈঞ্চা ইত্যাদি	৫৫-৬৫	২০-২২	শুকনো খড়ের সহিত ২ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে সরাসরি অথবা শতকরা ৩-৫ ভাগ চিটাগুড় ছিটিয়ে পরতে পরতে শুকনো খড় দিয়ে সাইলেজ তৈরী পূর্বক খাওয়ানো।
৭.	ট্রিটিক্যালী	৫০-৬০	১৬-২৫	খড়ের সহিত ২ঃ১-১ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে সরাসরি, অথবা একই অনুপাতে শতকরা ৩-৫ ভাগ চিটাগুড় মিশিয়ে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করে পরবর্তিতে খাওয়ানো।
৮.	আলু গাছ	৫০-৫৫	-	খড়ের সহিত ২ঃ১-১ঃ১ অনুপাতে মিশিয়ে সরাসরি অথবা একই অনুপাতে শতকরা ৩-৫ ভাগ চিটাগুড় মিশিয়ে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনের সময় খাওয়ানো।
৯.	ভুট্টা/সরগাম/জাম্বু ফডার	৫০-৬০	৮-১০	টুকরো করে সরাসরি সবুজ ঘাস হিসেবে অথবা টুকরো করে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনের সময় খাওয়ানো।
১০.	নেপিয়ার/স্পেন্ডিডা ফডার ইত্যাদি	৫০-৬০	৬.০-৭.০	টুকরো করে সরাসরি সবুজ ঘাস হিসেবে অথবা শতকরা ৩-৫ ভাগ চিটাগুড় সহ অথবা চিটাগুড় ব্যবহার না করে, সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনের সময় খাওয়ানো।

গবাদি পশুকে সাধারণত দুই ধরনের খাবার দেয়া হয়। একটি আঁশ জাতীয় খাদ্য এবং অপরটি দানাদার খাদ্য। আঁশ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ইউএমএস ভিত্তিক আঁশ জাতীয় খাদ্য মোটাতাজাকরণে সবচেয়ে উপযোগী। আঁশ জাতীয় খাদ্যের পাশাপাশি দৈনিক ওজনের ভিত্তিতে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

ঘাসের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়

ধরা যাক, একজন খামারীর ৫টি গাভী ও ৫টি বাছুর আছে। গাভীটির ওজন ৩৫০.০ কিলো এবং বাছুরটির দুধ ছাড়ানোর পর এর গড় ওজন ৫০.০ কিলো। অতএব, খামারীকে মোট ৪০০ কিলো ওজনের জন্য ঘাস সংগ্রহ করতে হবে। খামারী যদি বন্যা কবলিত অঞ্চলের হয় তাহলে তাকে ন্যূনতম ৬ মাসের খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

খামারীর ১টি গাভী ও ১টি বাছুর প্রতিদিন যে পরিমাণ ঘাস খাবে তা আমরা নিম্নলিখিত সমীকরণ থেকে পেতে পারি।

মাথাপিছু দৈনিক ঘাস গ্রহন = ৪.৮৮+০.০৪৭ × ৪০০ কিলো

= ৪.৮৮+১৮.৮০

= ২৩.৬৮ কিলো

অপচয়ের মাত্রা = ৩.৭৬-০.০০২ × ৪০০ কিলো

= ৩.৭৬-০.৮

= ২.৯৬ কিলো

অর্থাৎ উক্ত খামারীর ১টি গাভী ও ১টি বাছুরের দৈনিক মোট ঘাসের দরকার হবে

= ২৩.৬৮+২.৯৬

= ২৬.৬৪ কিলো

অপচয় মাত্রা রোধ করা গেলে দৈনিক গড়ে ২৫.০ কিলো ঘাস প্রয়োজন হবে উক্ত খামারীর জন্য ৬ × ৩০=১৮০ দিনে সর্বমোট ঘাস প্রয়োজন হবে

= ১৮০ × ২৫

= ৪৫০০ কিলো

= ৪.৫ টন (প্রায়)

সুতরাং ৫টি গাভী ও ৫টি বাছুরের জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ২২.৫ টন কাঁচা ঘাস।

খামারী যদি উক্ত ঘাস সাইলেজ করতে প্রয়োজন বোধ করেন তা হলে ঘাসের গঠনের ভিত্তিতে ৭৫০-৮০০ ঘনফুট মাটির গর্তে উক্ত ঘাস সাইলেজ করা যেতে পারে। কারণ ঘাসের গঠন এবং সাজানোর উপর প্রতি ১০০ ঘন ফুট মাটির গর্তে ২.৫০-৩.০০ টন ঘাস সাইলেজ করা যায়। উক্ত পরিমান ঘাস সংগ্রহ করার জন্য খামারীর নিজের জমি, প্রাকৃতিক উৎস্য ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন।

উল্লেখিত হিসাবগুলো বিবেচনায় রেখে একজন খামারী সাইলেজ উৎপাদন করতে পারেন। এর ফলে তার সারা বছরের খাদ্য সংকট কিছুটা হলেও সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সাইলেজ খাওয়ানোর পরিমান, খাদ্যমান এবং অপচয় রোধ

গবাদিপশুর রশদে দু'প্রকার খাদ্য বিদ্যমান

ক) আঁশ জাতীয় খাদ্য

খ) দানাদার জাতীয় খাদ্য

আঁশ জাতীয় খাদ্য যথেচ্ছা পরিমাণ সরবরাহ পূর্বক গরুর ক্ষুধা মেটানো প্রয়োজন। দানাদার খাদ্য খরচ বহুল এবং উৎপাদন মাত্রার উপর সরবরাহ করতে হয়। এজন্য খাদ্য উৎপাদন মৌসুমে অতিরিক্ত আঁশ জাতীয় খাদ্য সাইলেজ অথবা 'হে' করে সংরক্ষণ করা উচিত। আঁশ জাতীয় ঘাস এবং তৈরীকৃত সাইলেজের গুণগতমানের উপর পশুর খাদ্য গ্রহন মাত্রা নির্ভর করে। এ ছাড়া পশুর ওজন, ঘাসের বয়স, গঠন এবং কান্ড ও পাতার অনুপাতের উপর খাদ্য গ্রহন মাত্রাও নির্ভরশীল।

সারণী ৫.২ঃ নেপিয়ার ও সরগাম ঘাসের বয়সের সহিত পুষ্টিমান

ঘাসের নাম	বয়স/উচ্চতা	রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ (%)		পরিপাচ্যতা (%)	
		শুষ্ক পদার্থ	আমিষ	শুষ্ক পদার্থ	আমিষ
সরগাম	দুধ-দানা	২৩.৪	৯.৯১	৬২.৩	২২.১
	নরম দানা	২৭.৭	৮.৯২	৬৪.২	২০.৮
	শক্ত দানা	২৯.৯	৯.২৬	৪৬.০	৩৩.৪
নেপিয়ার	১ মিটার উচ্চতা	১৬.৯	১১.৯	৫৫.০	৭১.৭
	১.৫ মিটার উচ্চতা	১৬.৬	৭.৩০	৫১.৮	৬২.৩

সারণী ৫.২ এ নেপিয়ার ও সরগাম ঘাসের পুষ্টিমান দেখানো হ'ল।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, বয়স বৃদ্ধির সাথে ঘাসের পুষ্টিমান এবং পাচ্যতা হ্রাস পেয়েছে। নেপিয়ার, এন্ড্রোপগান ও স্প্লেনডিডা তিন ধরনের উচ্চ ফলনশীল ঘাস। এ ঘাসগুলো সারা বছর ব্যাপি হয়ে থাকে এবং সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়। গবাদিপশু কর্তৃক ঘাসগুলোর গ্রহন এবং অপচয় মাত্রা নীচে সারণী ৫.৩ এ প্রদান করা হল।

সারণী ৫.৩ঃ গবাদি পশু কর্তৃক নেপিয়ার ও এন্ডোপোগান ঘাসের গ্রহণ ক্ষমতা

গ্রহন ও অপচয় মাত্রা	নেপিয়ার	এন্ডোপোগান	স্প্লেনডিডা
গরুর ওজন (কিলোগ্রাম)	২১৮.০	২১৮.০	২১৮.০
যে পরিমাণ সাইলেজ দেয়া হয় (কিলোগ্রাম)	১৮.৩	১৭.৭	১৯.৯
সাইলেজ শুষ্ক পদার্থ (কিলোগ্রাম)	৩.৮৯	৪.৬৯	৪.১৬
সাইলেজ গ্রহন (কিলোগ্রাম)	১৫.৩	১৪.৩	১৬.৭
সাইলেজ শুষ্ক পদার্থ গ্রহন (কিলোগ্রাম)	২.৯৩	৩.৭০	৩.৩৩
দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে শুষ্ক পদার্থ গ্রহন (%)	১.৩২	১.৬২	১.৪৫
সাইলেজ অপচয় (শুষ্ক পদার্থের %)	২৫.৬	২১.৯	২০.৭
দৈনিক গোবর উৎপাদন, কিলোগ্রাম	৫.৮৯	৭.৫৫	৭.৪৩

উক্ত পরিমাণ সাইলেজ খাওয়ার পরও নির্দিষ্ট ওজনের ষাঁড়গুলোর দৈহিক ওজন হ্রাস পায়, এবং ওজন হ্রাসের মাত্রা ১২৫.০ গ্রাম হতে প্রায় ২৫০ গ্রাম পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর অর্থ হচ্ছে সরবরাহকৃত সাইলেজ হতে ষাঁড় প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়নি। উক্ত তিনটি সাইলেজের শুষ্ক পদার্থের পাচ্যতা ছিল ৪৫.০-৪৭%। গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, ষাঁড়গুলো নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুসারে সাইলেজ খেয়ে ছিল।

মাথা পিছু দৈনিক সাইলেজ গ্রহন (কিলোগ্রাম) = ৪.৮৮+০.০৪৭ X দৈহিক ওজন

একইভাবে সাইলেজের অপচয় মাত্রা নিম্নোক্ত সমীকরণ ব্যবহার করে পাওয়া যেতে পারে।

মাথা পিছু দৈনিক সাইলেজের অপচয় মাত্রা = ৩.৭৬+০.০০২ X দৈহিক ওজন

সাইলেজ গ্রহন মাত্রার সমীকরণটি এ ধরনের সাইলেজ হিসেবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অপচয়ের মাত্রা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যথা-

ক) ঘাসের বয়স

ক) ঘাস সরবরাহের পরিমাণ

খ) খাদ্য সরবরাহের স্থান

গ) ঘাসের গুণাগুন

ঘ) সাইলেজের গুণাগুন ইত্যাদি।

মাঠ পর্যায়ে অনেক সময় গরুর গোবর উৎপাদনের হিসাব প্রয়োজন হয়। সাইলেজ খাওয়ানোর ফলে যে হারে দৈনিক মাথাপিছু গোবর উৎপাদন হয় তা নিম্নে সমীকরণ ব্যবহারে হিসেব করা যেতে পারে।

মাথাপিছু দৈনিক তাজা গোবর উৎপাদন কিলোগ্রাম = ১.৮২+০.০২৩ X দৈহিক ওজন কিলো

উল্লেখিত আলোচনা হতে দৈনিক সাইলেজ গ্রহন মাত্রা (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে) গড়ে ১.৫০% । তবে, দুধালো গাভীর ক্ষেত্রে এর মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭৫-১.৮০% হতে পারে। তাজা সাইলেজের গ্রহন মাত্রা দৈনিক ৯.৫-১০% এর বেশী নয়।

উক্ত সমীকরণগুলো ব্যবহারে সাইলেজ খাওয়ানো এবং এর অপচয় মাত্রা হিসেব করা যেতে পারে। তবে, ঘাসের বয়সের উপর সাইলেজের গুণাগুন ও পুষ্টিমাত্রা নির্ভর করে।

দানাদার মিশ্রণঃ

একটি দানাদার খাদ্য মিশ্রণ কি ধরনের হবে, তা সাধারণত নির্ভর করে খামারী যে এলাকায় বসবাস করে তার প্রাপ্যতার উপর। খামারীদের সুবিধার জন্য নীচের সারণীতে একটি দানাদার মিশ্রণ তৈরীর বিভিন্ন উপাদান পরিমান সহ উল্লেখ করা হল। নিম্নের ৫.৪ নং সারণী অনুযায়ী অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী খামারীগণ তার এলাকার খাদ্য উপাদানের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিমান দানাদার মিশ্রণ তৈরী করে নিতে পারবেন।

সারণী ৫.৪ঃ বিভিন্ন খাদ্যোপাদান সমন্বয়ে সুষম খাদ্য তৈরীর অনুপাত

উপাদান	পরিমাণ (কেজি)				
১. গম/চাল/খুদ/ভূট্টা ভাঙ্গা	২০	১০	৪	২	১
২. গমের ভূষি/খেসারী ভূষি	২৫	১২.৫	৫	২.৫	১.২৫
৩. চালের কুড়া	২৫	১২.৫	৫	২.৫	১.২৫
৪. সরিষা/তিল/নারিকেলের খৈল/সয়াবিন মিল	২০	১০	৪	২	১
৫. শুটকি মাছ (প্রাপ্যতার উপর)	৫	২.৫	১	৫০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
৬. ঝিনুকের গুড়া	৪	২	৮০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
৭. লবণ	১	৫০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম
মোট	**১০০ কেজি**	**৫০ কেজি**	**২০ কেজি**	**১০ কেজি**	**৫ কেজি**

খাওয়ানোর পরিমাণঃ

গরুকে তার দেহের ওজন অনুপাতে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। উপরের দানাদার মিশ্রণটি গরুর ওজনের শতকরা ০.৮-১ ভাগ পরিমান সরবরাহ করলেই চলবে।

খাওয়ানোর সময়ঃ দানাদার মিশ্রণটি একবারে না খাইয়ে দুই ভাগে ভাগ করে সকালে এবং বিকালে খাওয়াতে হবে।

পানিঃ গরুকে পর্যাপ্ত পরিমানে পরিস্কার খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।

মডিউল-৬
কাঁচা ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও নাইট্রেড বিষক্রিয়া

আলোচিত বিষয় সমূহঃ

৬.১. ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সমন্ধে পরিচিতি

৬.২. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পাবে:

- সাইলেজের উদ্দেশ্য এবং কেন সাইলেজ করা হয় সে সমন্ধে ধারণা পাবে।
- কোন ধরনের ঘাস সাইলেজ বা হে করার উপযোগী সে সম্পর্কে ধারণা পাবে।
- সাইলোর শ্রেণীবিন্যাস ও তাদের সুবিধা-অসুবিধা সমন্ধে জানতে পারবে।
- কম খরচে সাইলেজ বা হে কি ভাবে করা হয় সে সমন্ধে ধারণা পাবে।
- সাইলেজ এডিটিভ ও এর ব্যবহার সমন্ধে জানতে পারবে।
- ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য, পুষ্টিমান ও ব্যবহার সমন্ধে ধারণা পাবে।

৬.৩ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব

- সাইলেজ ও হে তৈরী করার জন্য কি কি উপাদান লাগবে তা সরেজমিনে দেখানোর আয়োজন করা।

ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রাণালীঃ

কাঁচাঘাস সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে কাঁচাঘাস কাঁচা অবস্থায়ই সংরক্ষণ, এই সংরক্ষিত কাঁচাঘাসকেই সাইলেজ বলা হয়। অপরটি হচ্ছে কাঁচাঘাস শুকিয়ে সংরক্ষণ, যাকে হে বলা হয়ে থাকে। তবে সাইলেজ এবং হে তৈরীর জন্য উপযুক্ত ঘাসের মধ্যেও প্রকারভেদ রয়েছে। এছাড়াও সেগুলো সংরক্ষণ করতে ঘাসের মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রায় জলীয় উপাদান থাকাও বাঞ্চনীয়। নিম্নে সাইলেজ ও হে তৈরীর পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হ'ল।

সাইলেজের উদ্দেশ্য

সাইলেজ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় (বিশেষ করে বর্ষাকাল, বন্যায়, খরায়, শীতকালে) গবাদি পশুকে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা। এতে কাঁচা ঘাসের অপচয় কম হয় এবং উহার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সাইলেজ তৈরীর মূলনীতি হলো, যখন উদ্ভিদ কোষ অক্সিজেন (O_2) বিহীন অবস্থায় ফার্মেন্টেট বা গাঁজন হয়, তখন ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন হয়ে থাকে, এবং এই ল্যাকটিক এসিড সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সহায়তা করে থাকে।

সাইলেজের উপকারিতা

১। ঘাসের সাইলেজে ৮৫ % পুষ্টি পাওয়া যায়।

২। ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়।

৩। বর্ষা মৌসুমে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা কঠিন, কিন্তু সাইলেজ সহজেই সংরক্ষণ করা সম্ভব।

৪। সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড সমৃদ্ধ খাদ্য।

৫। এটা আমিষ ও ভিটামিনের উৎস।

সাইলেজ তৈরীর উপযোগী ফডার

বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরী করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরী করার জন্য সাধারণতঃ নন- লিগিউম জাতীয় ফডার বা সবুজ ঘাস সবচেয়ে বেশী উপযোগী। যেমন, ওট, ভূট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার প্রভৃতি অন্যতম। তবে লিগিউম জাতীয় ফডার দিয়েও সাইলেজ তৈরী করা যেতে পারে। লিগিউম জাতীয় ফডার যেমনঃ বারশিম, লুসার্ণ, কাউপি কিংবা মাটি কালাই দিয়ে সাইলেজ তৈরী করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। যেমন, বারশিমের সাথে ওট এবং কাউপির সাথে ভূট্টা মিশিয়ে অথবা খড় মিশিয়ে সাইলেজ করা যায়। এভাবে সাইলেজ তৈরী করলে লিগুমিনাস ফডারে যে কার্বহাইড্রেট কম থাকে তার অভাব পূরণ করে কার্বহাইড্রেট পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং পানির পরিমান কমে আসে। ফলে, সাইলেজ ভাল ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং খড় ব্যবহার করলে তার পুষ্টিমানও বৃদ্ধি পায়।

সাইলেজ সংরক্ষণের মূলনীতি

সাইলো পিটে সবুজ ঘাস টুকরা টুকরা করে কেটে পরতে পরতে সাজানোর পরও উহার মধ্যে হাজার হাজার ছোট ছোট পকেটের ফাঁকে অক্সিজেন (O_2) থেকে যায়। যার ফলে উদ্ভিদ এনজাইমের এ্যারোবিক শ্বসন ক্রিয়া শুরু হয়। এমতাবস্থায়, ঘাসে উপস্থিত শ্বেতসার এর এক অংশ জারণ ক্রিয়ার দ্বারা তাপসহ কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন করে, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারিক ভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শেষ হয়ে যায় এবং উহা মোল্ডের বৃদ্ধি ব্যহত করে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড এর উপস্থিতিতে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। সাইলো পিটের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে বায়ু থাকলে বেশী তাপ উৎপন্ন হয়, ফলে সাইলেজের উপর গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের দানা পড়ে। ইহাতে দ্রবনীয় শ্বেতসার অধিক পরিমান নষ্ট হয় এবং আমিষের পরিপাচ্যতা কমে যায়। ফলে সাইলেজের পুষ্টিমান খুবই নিম্নমানের হয়।

এরোবিক শ্বসনের পর মাইক্রোবিয়াল পরিবর্তন শুরু হয়। কোন কোন এসিড তৈরী যেমন *Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus faecalis, Pediococcus acidilacti, Lactobacillus copyneformis* ইত্যাদি উদ্ভিদ কোষকে মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেন অনুপস্থিতির কারণে তাদের বৃদ্ধির জন্য অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সুগার পরিবর্তিত হয়ে প্রধানতঃ ল্যাকটিক এসিডে পরিণত হয় এবং পরে ইহা অন্যান্য ফ্যাটি এসিড যেমন ফরমিক এসিড, এসেটিক এসিড, প্রোপাওনিক ও বিউটারিক এসিডে পরিণত হয়। সাইলোর মধ্যে এসিডের পরিমান কমে পি.এইচ ৩.৭ হলে ব্যাক্টেরিয়াল গাঁজন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তিতে এই এসিডগুলো অন্যান্য ক্ষতিকর

ব্যাকটেরিয়াকে নিধন করতে সহায়তা করে এবং সাইলেজকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে সহায়তা করে। তবে, এক্ষেত্রে সাইলেজের বায়ুহীন অবস্থা বজায় রাখতে হবে।

সাইলোক্রিয়ার সময় প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ প্রোটিন ভেঙ্গে এমাইনো এসিডে রূপান্তরিত হয়। প্রোটিনের পুষ্টিমানের উপর প্রভাব বিস্তার না করলেও উহা সংরক্ষণের জন্য খারাপ পদার্থ। এমাইনো এসিড ভেঙ্গে বিভিন্ন এমাইন তৈরী করে যেমন, ট্রিপটামিন, ফিনাইল ইথায়লামিন, হিস্টামিন, বিউটেন ও পেন্টামিথাইলিন ডাই এমিন প্রভৃতি।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিক্রিয়া দেয়া হলোঃ

সবুজ ঘাস + ৬ অনু পানি + ৬ অনু কার্বন ডাই-অক্সাইড + ৬৭৩ ক্যালোঃ শক্তি ⟶ চিনি + অক্সিজেন

চিনি ⟶ ল্যাকটিক এসিড ⟶ বিউটারিক এসিড + পানি + কার্বন ডাই-অক্সাইড

এনসাইলিং প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

নিম্নে এনসাইলিং প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করা হ'ল। এনসাইলিং বেশ কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ধাপসমূহ হচ্ছেঃ

ক) **অক্সিজেন পর্বঃ** ঘাস উপযুক্তভাবে সাজানোর পরও কিছু অক্সিজেন ভিতরে থেকে যায়। বিদ্যমান অক্সিজেন ঘাসের আমিষ নষ্ট করে, অতিরিক্ত তাপ উৎপাদন করে এবং অবাঞ্ছিত ইষ্ট বা ফাংগাস উৎপাদনে সাহায্য করে। এ সমস্যা দুর করার জন্য ঘাস দ্রুত এবং পিটের সবদিকে পুর্নভাবে সাজাতে হবে, ছোট ছোট টুকরো করে ঘাস কাটতে হবে এবং নির্দেশিত পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) **ল্যাকটিক এসিড পর্বঃ** সঠিকভাবে ঘাস সংরক্ষিত হলে দ্রুত ল্যাকটিক এসিড উৎপাদন হয় এবং ঘাসে বিদ্যমান পঁচন প্রক্রিয়ায় সহায়ক জীবানু ধ্বংস করে। পিএইচ ৫.০ এর নীচে নামিয়ে দেয়, এবং ঘাসকে সংরক্ষিত রাখে।

গ) **অক্সিজেন শূণ্য পর্বঃ** এ পর্বে ঘাসে বা সাইলো পিটে অক্সিজেনের মাত্রা প্রায় শূণ্য থাকে এবং ইস্ট বা মোল্ড বাঁচতে পারে না।

ঘ) **সাইলেজ খাওয়ানো পর্বঃ** ভাল মানের সাইলেজ সাইলো পিটে পরতে পরতে সাজানো থাকে, ঘাসের গঠনের তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। এ ধরনের সাইলেজ খাওয়ানোর সময় এক পার্শ্ব হতে সাইলেজ সংগ্রহ এবং পলিথিন ব্যবহারে যথাযথভাবে ঢেকে রাখা প্রয়োজন। এলোমেলোভাবে সাইলেজ সংগ্রহ এবং যথাযথভাবে ঢেকে না রাখলে সংরক্ষিত ঘাসের গুণগতমান দিন দিন হ্রাস পেতে পারে। উক্ত পর্বগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাইলেজে দ্রুত ল্যাকটিক এসিড উৎপাদিত হলে সংরক্ষিত ঘাসের গুণগতমানও উন্নত হয়। এক্ষেত্রে, সাইলেজে এ্যাডিটিভ ব্যবহার করা যেতে পারে।

এনসাইলিং প্রক্রিয়ায় সাইলেজে এ্যাডিটিভ এর ব্যবহার

১) গাঁজন উদ্দীপক (Stimulants of fermentation)

Microbial inoculum, Enzyme additive, fermentable পদার্থ এবং চিটাগুড় এ ধরনের Stimulants এর অন্তর্ভূক্ত। Microbial inoculant হিসেবে ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া সাধারণত ব্যবহার হয়। সেলুলেজ এবং অ্যামাইলেজ ইত্যাদি এনজাইম সাধারণত additive হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলো আঁশ অথবা Starch digestion এ সাহায্য করে এবং সাইলেজের গুণগতমান বৃদ্ধি করে। কিন্তু, আমাদের দেশে এগুলো এখনও পাওয়া যায় না এবং ব্যবহারের প্রচলনও হয়নি। আমাদের দেশে বহুল পরিচিত চিটাগুড় একটি উত্তম Stimulants of fermentation। শুধু তা-ই নয়, চিটাগুড় সাইলেজের এ্যারোমা বা গন্ধও বৃদ্ধি করে। ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় রেখে শুধুমাত্র চিটাগুড় Stimulants of fermentation হিসেবে ব্যবহার এখানে আলোচনা করা হল। চিটাগুড় সুগারমিলের একটি উপজাত। এর মধ্যে ৭০-৭৫% শর্করা বিদ্যমান। উক্ত শর্করা হতে খুব সহজেই জৈব এসিড তৈরী হয় এবং ঘাস সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চিটাগুড়ে প্রচুর পরিমাণ মিনারেল বা খনিজ পদার্থ থাকে, যা সাইলেজের খনিজ পদার্থকে বৃদ্ধি করে। প্রতি ১০০ কিলো সবুজ ঘাসে ২ থেকে ৪ কিলো চিটাগুড় ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, মনে রাখতে হবে সকল ঘাসেই চিটাগুড় মিশানো প্রয়োজন নেই। যেমন ভুট্টা ঘাসে চিটাগুড় ছিটানো প্রয়োজন নেই। উন্নত পুষ্টি সম্পন্ন ঘাসে চিটাগুড় না দিয়েও সাইলেজ তৈরী করা যায়।

২) গাঁজন রোধক (Inhibitors of fermentation)

জৈব এসিড হচ্ছে গাঁজন রোধক পদার্থ। এ ধরনের additive এর মধ্যে প্রোপিওনিক এসিড অথবা এ্যামোনিয়াম প্রোপিওনেট সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, এগুলোর ব্যবহার আমাদের দেশে এখনও শুরু হয়নি। এর ফলে সাইলেজের মূল্যও বৃদ্ধি পাবে।

প্রোপিওনিক এসিড সাইলেজ-এ্যাডিটিভ হিসেবে যে কাজটি করে তা হলো ইস্ট ও মোল্ড বা ছত্রাকের বৃদ্ধি-হ্রাস করে। অর্থাৎ এর জীবানু প্রতিরোধী ক্ষমতা (Antimycotic activity) অনেক প্রখর। সাইলেজে সাধারণত ০.২ হতে ১.০% পর্যন্ত প্রোপিওনিক এসিড ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া, বেনজোয়িক এসিড, সরবিক এসিড অথবা সাইট্রিক এসিডও ব্যবহার হতে পারে।

৩) নিউট্রিয়েন্ট এডিটিভ বা পুষ্টি-উপাদান সংযোজনী (Nutrient additives)

অ্যামোনিয়া (Ammonia), ইউরিয়া (Urea) ইত্যাদি হচ্ছে পুষ্টি-উপাদান সংযোজনী যা অনেক সময় সাইলেজের পুষ্টিমান বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে, মনে রাখতে হবে ইউরিয়া যোগ করা হলে সাইলেজের পিএইচ বৃদ্ধি পেতে পারে। মনে রাখতে হবে additive ব্যবহার করে সাধারণত সাইলেজের গুণগতমান বৃদ্ধি করা যায়। তবে, কোন মতেই ইহা উত্তম পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরীর বিকল্প নয়।

ইউরিয়া প্রিজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহার করে সাইলেজ তৈরী করা হয়। যে সমস্ত ঘাস শক্ত এবং জলীয়াংশ কম থাকে এ সকল ঘাস ইউরিয়া দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। এর ফলে ঘাস সংরক্ষিত থাকে এবং পুষ্টিমানও বৃদ্ধি পায়। যেমন-তাজা ও ভেজা খড়ের সাইলেজ তৈরী করা। এ পদ্ধতিতে ধানের তাজা ও ভেজা খড় শতকরা ২.০-২.৫% ইউরিয়া দিয়ে সাইলেজ প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করা হলে ধানের খড়ের সাইলেজ তৈরী হবে।

৪) শোষক পদার্থ (Absorbant)

ঘাসের কোষের মধ্যে অথবা গায়ে অতিরিক্ত পানি থাকলে শুষ্ক পদার্থের পরিমান কম থাকে। এর ফলে সাইলেজের বর্জ্য (effluent loss) বৃদ্ধি পায়। সাইলেজের বর্জ্যের সাথে অনেক পুষ্টি উপাদান ঘাস থেকে বেরিয়ে আসে। উপযুক্ত বয়সে ঘাস কাটা না হলে, বৃষ্টি বা বন্যার পানির মধ্যে ঘাস সংগ্রহ করা হলে অথবা জন্মগতভাবে অতিরিক্ত পানি ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ঘাস দ্বারা সাইলেজ করা হলে ঘাসের পরতে পরতে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে শুকনো খাদ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। শুকনো খাদ্য হিসেবে ধানের খড়, চালের কুড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলোকে Absorbent বলা হয়। Absorbent ঘাসের অতিরিক্ত জলীয়াংশ শুষে নেয় যার সাথে পুষ্টি উপাদানগুলোও সংরক্ষিত হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিকভাবে বর্ষাকালে উৎপাদিত ঘাস যেমন- দল, সেচি, আলু গাছ ইত্যাদি ঘাসের সাইলেজ করার সময় সর্বোচ্চ ৫% পর্যন্ত খড় Absorbent হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। Additive যেমন ঘাসের গুণগতমান উন্নত করে না, তেমনি Absorbent ও ঘাসের গুণগতমান উন্নয়ন না করে শুধুমাত্র গুণগতমানের সাইলেজ উৎপাদনে সাহায্য করে।

বিভিন্ন ধরনের সাইলো সুবিধা ও অসুবিধা সহ

আবহাওয়া, খামারের আকার, খামারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং উপযোগীতার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার সাইলো ব্যবহার করা হয়। নিম্নে সুবিধা-অসুবিধা সহ বেশ কয়েকটি সাইলোর নাম দেয়া হলোঃ

১। টাওয়ার সাইলো

এটা সাধারনত আমাদের দেশে খুব একটা প্রচলিত পদ্ধতি নয়। এটা কয়েক ধরনের হতে পারে যেমনঃ (ক) কংক্রিট স্টেভ (খ) কাঠের স্টেভ (গ) স্টিল স্টেভ (ঘ) ইটের স্টেভ ঙ) টাইলস স্টেভ

টাওয়ার সাইলোর সুবিধা ঃ

ক) বড় বড় গবাদিপশুর খামারের জন্য ভাল পদ্ধতি।

খ) সাইলেজ অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং গুণগত মান অনেক ভাল।

গ) প্রাথমিক ভাবে খরচ বেশি হলেও দীর্ঘস্থায়ী বলে সার্বিকভাবে সাইলেজের উৎপাদন খরচ কম।

গ) সাইলেজের নষ্ট/পঁচন রোধ করে বলে উৎপাদন খরচ কমে আসে।

টাওয়ার সাইলোর অসুবিধা ঃ

ক) আমাদের দেশের দরিদ্র খামারিদের জন্য উপযোগী নয়।

খ) প্রান্তিক বা ছোট ছোট খামারের জন্য সাশ্রয়ী নয়।

গ) দুর্যোগ মুহূর্তে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়না।

২। পিট সাইলো

পিট সাইলো মাটির গর্তেও হতে পারে, আবার কংক্রিট/পাকা হাউজের মতও হতে পারে।

কংক্রিট সাইলো

মাটির পিট/গর্ত সাইলো

কংক্রিট পিট সাইলোঃ এটা ইটের অথবা আরসিসি ঢালাই-এর মাধ্যমে তৈরী হাউজের মত। এটা মাটির নিচেও হতে পারে, আবার মাটির উপরেও হতে পারে।

কংক্রিট পিট সাইলোর সুবিধাঃ

ক) ছোট ছোট বানিজ্যিক খামার সহ বড় বড় গবাদিপশুর খামারের জন্য ভাল পদ্ধতি।

খ) একবার তৈরী করতে পারলে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।

গ) বায়ুরোধক ও পানি শোষণ করে না বলে সাইলেজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং এর গুণাগুণও ভাল থাকে।

কংক্রিট পিট সাইলোর অসুবিধাঃ

ক) পুরোপুরি বায়ুরোধক করা কঠিন বলে অনেক সময় সাইলেজ নষ্ট হয়ে যায়।

খ) পিটের উপরে এবং নিচের বেশ কিছু অংশে পঁচে নষ্ট হয় বলে সাইলেজের গুনগত মান কমে যায়।

গ) প্রাথমিক খরচ একটু বেশি বলে দরিদ্র প্রান্তিক খামারিদের জন্য উপযুক্ত নয়।

ঘ) দুর্যোগ মূহুর্তে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়না।

মাটির পিট সাইলোঃ মাটির নিচে বেশ কিছুটা গভীর ও চওড়া করে মাটির পিট সাইলো তৈরী করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এটির প্রচলন রয়েছে।

মাটির পিট সাইলোর সুবিধাঃ

ক) ছোট ছোট বানিজ্যিক খামার সহ বড় বড় গবাদিপশুর খামারের জন্য ভাল পদ্ধতি।

খ) প্রাথমিক খরচ কম।

গ) আমাদের দেশের দরিদ্র প্রান্তিক বা ছোট ছোট খামারের জন্য বেশ উপযোগী ও সাশ্রয়ী।

মাটির পিট সাইলোর অসুবিধাঃ

ক) পুরোপুরি বায়ুরোধক করা কঠিন এবং বর্ষাকালে পানি শোষণ করতে পারে বলে বেশিদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় না।

খ) পিটের উপরে এবং নিচের বেশ কিছু অংশে পঁচে নষ্ট হয় বলে সাইলেজের গুনগত মান কমে যায়।

গ) দুর্যোগ মূহুর্তে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়না।

৩। সমান্তরাল সাইলো

সমান্তরাল সাইলো মাটির উপরে বা নিচের উপর ভিত্তি করে দু'রকমই হতে পারে যেমনঃ (ক) ট্রেঞ্চ সাইলো (মাটির গর্তে) (খ) বাঙ্কার সাইলো (মাটির উপর)

বাংকার সাইলোঃ মাটির উপরে বাংকারের মত তৈরী করা হয় বলে একে বাংকার সাইলো বলে। বাংকার সাইলো ইট, আরসিসি ঢালাই কিংবা মেটালিক সিটেরও হতে পারে। এর তিন দিক ঘেড়া থাকে। পার্শ্বের খোলা এক প্রান্ত থেকে ভেতরের দিকে ঘাস পূর্ণ করা হয় এবং পুরোপুরি বাংকার ভরে গেলে উপরের খোলা প্রান্ত পলিথিন/টিন/মেটালিক সিট দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

বাঙ্কার সাইলোর সুবিধাঃ

ক) এটি মধ্যম থেকে বড় বড় বাণিজ্যিক খামারের জন্য ভাল পদ্ধতি।

খ) এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি বলে একবার তৈরী করলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

গ) ট্রাক্টর কিংবা ট্রলিতে ঘাস ভরে ভরে অল্প সময়ে এবং খুব সহজেই বাংকার পূর্ণ করা যায়।

বাঙ্কার সাইলোর অসুবিধাঃ

ক) এটি দরিদ্র প্রান্তিক বা ছোট ছোট খামারের জন্য বেশ উপযোগী নয়।

খ) প্রাথমিক খরচ বেশি।

গ) দুই প্রান্ত খোলা বলে বায়ুরোধ করা বেশ কঠিন।

ঘ) দুযোর্গ মুহূর্তে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়না।

ট্রেঞ্চ সাইলোঃ মাটির ভেতরে গর্ত করে সুরঙ্গের মত যে সাইলো তৈরী করা হয় তাকে ট্রেঞ্চ সাইলো বলা হয়। এটির সুবিধা-অসুবিধা অনেকটা মাটির পিট সাইলোর মতই।

৪। স্বল্পস্থায়ী সাইলো

এই ধরনের সাইলোর স্থায়ীত্ব খুবই কম। তবে ড্রাম সাইলো সাধারনত বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। স্বল্পস্থায়ী সাইলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমনঃ (ক) পলিব্যাগ সাইলো, (খ) ড্রাম সাইলো, (গ) ডোল সাইলো

পলিব্যাগ সাইলো

ড্রাম সাইলো

ডোল সাইলো

পলিব্যাগ সাইলোঃ মোটা পলিথিন পেপারের ব্যাগ তৈরী করে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হয় বলে একে পলিব্যাগ সাইলো বলা হয়। এটা কম খরচে সাইলেজ সংরক্ষনের একটি অস্থায়ী পদ্ধতি, কারন একবার সংরক্ষনের পরে পলিব্যাগ সাধারনতঃ আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যায়না।

পলিব্যাগ সাইলোর সুবিধাঃ

ক) খরচ কম বলে এটি একটি দরিদ্রবান্ধব পদ্ধতি।

খ) কম গরু পালনকারীদের জন্য এটি বেশ উপযোগী।

ঘ) এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজেই স্থানান্তরযোগ্য।

পলিব্যাগ সাইলোর অসুবিধাঃ

ক) ঘাস ভালভাবে চাপ দিয়ে আঁটো-সাঁটো করে রাখা যায় না, কারন পলিথিন ছেঁড়ার সম্ভাবনা থাকে।

খ) পর্যাপ্ত চাপ দিয়ে বায়ুরোধ করা যায়না বলে সাইলেজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়না।

গ) প্রয়োজনীয় পরিমান ঘাস সংরক্ষণের জন্য চাহিদা মাফিক আকারের পলিব্যাগ তৈরী করা মুস্কিল।

গ) বৃহৎ খামারিদের জন্য অনুপযুক্ত।

ড্রাম সাইলোঃ প্লাস্টিকের তৈরী ড্রামে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হয় বলে একে ড্রাম সাইলো বলা হয়। প্লাস্টিকের পানির ট্যাংকেও সাইলেজ সংরক্ষন করা যেতে পারে।

ড্রাম সাইলোর সুবিধাঃ

ক) এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ঘাসকে আলো, বাতাস ও জলীয় বাষ্প হতে সহজেই রোধ করা যায় বলে এর গুণাগুণ দীর্ঘদিন যাবৎ ভাল থাকে।

খ) প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য।

গ) কম গরু পালনকারীদের জন্য এটি বেশ উপযোগী।

ঘ) এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজেই স্থানান্তরযোগ্য।

ড্রাম সাইলোর অসুবিধাঃ

ক) প্লাষ্টিকের ড্রাম কেনার জন্য প্রাথমিক খরচ একটু বেশিই লাগে।

খ) প্রয়োজনী পরিমান ঘাস সংরক্ষণের জন্য চাহিদা মাফিক আকারের ড্রাম পাওয়া দুষ্কর।

গ) বৃহৎ খামারিদের জন্য ছোট ছোট ড্রামে সংরক্ষণ বেশ কষ্টসাধ্য।

ডোল সাইলোঃ গ্রামে-গঞ্জে ধান সংরক্ষণের জন্য বাঁশের তৈরী গোলাকার সিলিন্ডারের ন্যায় ডোলে সাইলেজ সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে ডোল সাইলো বলে। এবং ডোলে সংরক্ষণ করা হয় বলে এই প্রকার সাইলেজকে ডোল সাইলেজ বলে।

ডোল সাইলোর সুবিধাঃ

ক) ডোল গ্রামে-গঞ্জে সহজ প্রাপ্য এবং এর মূল্য খুব একটা বেশি নয় বলে এটি একটি দরিদ্রবান্ধব পদ্ধতি।

গ) ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের ডোল পাওয়া যায় বলে কম ও বেশ ক'টা গরু পালনকারী খামারীদের জন্য এটি বেশ উপযোগী।

ঘ) ডোল সাইলো সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরযোগ্য।

ঙ) একবার ডোল ক্রয় করলে অনায়াসেই তা ২-৩ বছর ব্যবহার করা যায়।

ডোল সাইলোর অসুবিধাঃ

ক) এটি স্থায়ী পদ্ধতি নয় বলে ২-৩ বছর পর পর ডোল ক্রয় করতে বার বার খরচ করতে হয়।

খ) কংক্রিট বা ড্রাম সাইলোর মত যথেষ্ট পরিমান চাপ দেয়া যায়না (পলিথিন ছেঁড়া বা ডোল নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে) বলে অনেক সময় ভেতরে বাতাস ঢুকে সাইলেজ পঁচে যেতে পারে। ফলে সাইলেজের গুণাগুণ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

গ) বড় বড় বানিজ্যিক খামারিদের জন্য এটি খুব একটা উপযোগী নয়।

৫। গ্যাসটাইট সাইলো

আমাদের দেশে এ ধরনের সাইলো ব্যবহার করা হয় না। এর সুবিধা-অসুবিধা টাওয়ার সাইলোর মতই। গবাদি পশুর বড় বড় বানিজ্যিক খামারে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। এর নির্মান ব্যয়ও যথেষ্ট বেশি। এটা দুরকমের হতে পারে যেমনঃ (ক) কংক্রিট স্টেভ ও (খ) ইটের স্টেভ

সাইলেজ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা

আমাদের দেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে সহজে ও কম খরচে একজন কৃষক যাতে সাইলেজ তৈরী করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো।

মাটির গর্ত (পিট) পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে খামারীরা অতি সহজেই সাইলেজ তৈরী করতে প্যারেন । এই পদ্ধতিতে প্রচলিত ফডার ছাড়াও অপ্রচলিত ফডার যেমন মেইজ স্ট্রোভার এমনকি প্রাকিতিক সবুজ ঘাস প্রভৃতিকে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করা যায় । এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যে পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস পাওয়া যায় তা এ পদ্ধতি অনুসরণ করে সাইলেজ করা যায় । একশত ঘনফুট (১০০) একটি মাটির গর্তে ২.৫০-৩.০০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায় । সাইলেজের গর্তটি উঁচু জায়গায় হতে হবে, যাতে গর্তের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে । গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হতে হবে । গর্তের দৈর্ঘ্য সাধারনতঃ সবুজ ঘাসের পরিমানের উপর নির্ভর করে থাকে । গর্তের তলার চার কোণা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে । মাটির গর্তে ঘাস সাজানোর সময় সাইলোর চারিদিকে পলিথিন মুড়ে অথবা সাইলোর নীচে এবং চারিদিকে খড় দিয়ে মাটি ঢেকে তার উপর স্তরে স্তরে ঘাস সাজিয়ে "সাইলেজ" করলে ঘাস নিশ্চিন্তে অনেক দিন রাখা যায় । নিম্নে ২০ ফুট লম্বা একটি মাটির গর্তের সাইলো নমুনা দেখানো হলো ।

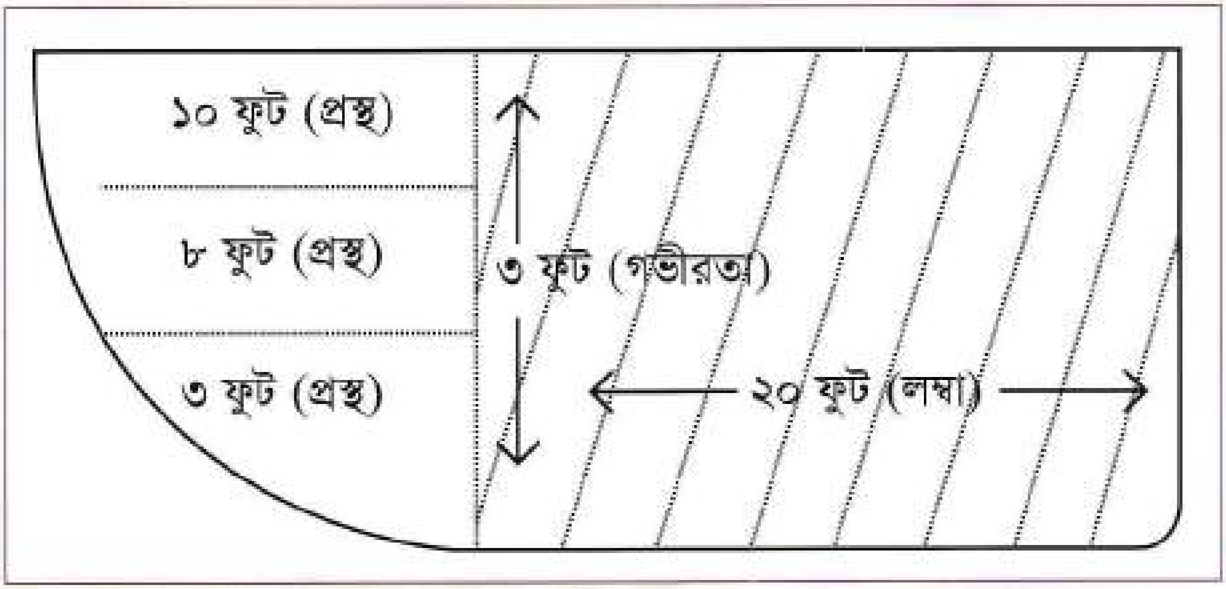

সাইলেজ তৈরীর পদ্ধতি

সাইলেজ প্রস্তুত করার পূর্বে নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহ অবশ্যই হাতের কাছে রাখতে হবে ।

১। পরিমান মত কাঁচা ঘাস।

২। সাইলো বা যেখানে সাইলেজ সংরক্ষণ করা হবে (যেমনঃ মাটির গর্ত, বাঁশের ডোল, ড্রাম, পলিব্যাগ ইত্যাদি)।

৩। প্রয়োজনমত পরিমান ও শক্ত পলিথিন পেপার।

৪। পাস্টিকের রশি।

৫। ঘাস কাটা যন্ত্র (কাঁচি/কাস্তে অথবা চপার মেশিন)।

৬। প্রয়োজনীয় পরিমান ইউরিয়া/লালীগুড় এবং পানি।

৭। ইউরিয়া/লালীগুড় ছেটানো ঝাঁঝড়া/ঝড়না অথবা হাত দিয়ে ছেটানোর মগ।

৮। সংরক্ষক বা প্রিজারভেটিভ (যেমনঃ লালীগুড়, ইউরিয়া)।

৯। শুকনা খড়।

যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে তা প্রথমে টুকরা টুকরা (প্রায় ৩-৪ ইঞ্চি পরিমান) কেটে নিতে হবে। কম পরিমান ঘাস হলে হাতেই কাঁচি দ্বারা কাটা যায়। আর যারা অধিক পরিমানে কিংবা বানিজ্যিক ভাবে সাইলেজ করতে চান তারা গ্রাস চপার মেশিন (নিম্নের ছবিতে দেখুন) ব্যবহার করতে পারেন। মাটির গর্তে ঘাস দেওয়ার পূর্বে এর তলায় পলিথিন অথবা ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছাতে হবে। টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলো পিটের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাত হবে, যেন ভিতরে বাতাস না থাকে। ঘাস যত বেশী চাপ দিয়ে মাটির গর্তে রাখা যাবে সাইলেজ তত বেশী উন্নত মানের হবে। সাইলেজ মোলাসেস সহ অথবা মোলাসেস ছাড়াও করা যেতে পারে। মোলাসেস ব্যবহার করলে, সুবজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১:১ অথবা ৪:৩ পরিমাণে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে। প্রতি ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে (স্তরে) পূর্বের হিসেবে ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৯ থেকে ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাঁচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে হবে। উপরের নিয়মে প্রতি ৩০০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে ১৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর মোলাসেস দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না। যতটা সম্ভব ভালভাবে পা দিয়ে পাড়িয়ে/মাড়িয়ে ভাল ভাবে আট সাট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এঁটে সাজানো যাবে সাইলেজ তত সুন্দর হবে এবং বেশি দিন সংরক্ষণ করা যাবে। সাইলো ভর্তি হলে মুখের উপরে ৪-৫ ইঞ্চি পর্যন্ত খড় সাজাতে হবে। সব শেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন দিয়ে ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সাইলো গর্ত একদিনেই সাজানো ভাল। তবে একদিনে বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে সাজানো সম্ভব না হলে প্রতিদিন অল্প অল্প করেও কয়েকদিন ব্যাপী সাজিয়ে সাইলেজ তৈরী করা যায়।

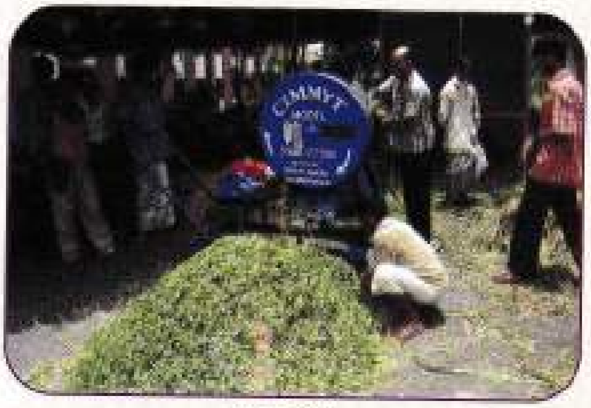

মেশিন চপিং

হ্যান্ড মেশিন চপিং

ব্যুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজ

মাটির গর্ত ছাড়াও পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ তৈরী করা যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরী খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য পলিথিন ব্যাগ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিতে ৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি আকারের ব্যাগ সাইলেজ তৈরী করতে পারেন। এ ধরনের ব্যাগ সাইলেজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদি পশু না থাকলেও তিনি তার নিজস্ব জমিতে শুধু ঘাস উৎপাদন এবং ব্যাগ সাইলেজ করে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ব্যাগ সাইলেজ অতি সহজেই পরিবহন করা যায়। মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরীর যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ব্যাগ পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ব্যাগ পরিপূর্ণ করার পর ভালভাব মুখ বেধে রাখতে হবে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসটিটিউড গবেষণা করে দেখেছে যে, ব্যাগ পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস, এমনকি মেইজ স্টোভার সাইলেজ করে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

ড্রাম সাইলেজ

এই পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরী করতে বাজারে ব্যবহৃত রং এর যে ড্রাম পাওয়া যায় তা ক্রয় করতে হবে। এই ধরনের ড্রামে সাধারনত ১২০ লিটার পানি ধারন করে। এর চেয়ে আরো বড় আকারের ড্রাম বাজারে পাওয়া গেলে সেটা আরো ভাল। এমনকি

বাজারে প্রাপ্ত পানির প্লাষ্টিকের ট্যাংক (৫০০ লিঃ থেকে ৫,০০০ লিটার ধারন ক্ষমতার) এও সাইলেজ সংরক্ষণ করা যায়। তবে, খেয়াল রাখতে হবে ড্রাম/ট্যাংকের মুখটা যেন গোলাকার এবং প্রশস্ত হয়। ড্রাম বাজার থেকে কিনে আনার পর পরিস্কার কলে ধুয়ে রৌদ্রে শুকাতে হবে যাতে পূর্বে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ বা অন্য কোন ক্ষতিকারক পদার্থ না থাকে। ড্রাম শুকানোর পর মাঠ থেকে কেটে আনা কাঁচা ঘাস টুকরো টুকরো করে কেটে পরতে পরতে ড্রামের মধ্যে সাজাতে হবে এবং সেই সংগে চাপ দিতে হবে যাতে ভেতরের বাতাস বেড়িয়ে যায়। ঘাসের সাথে লালীগুড়ও মেশানো যেতে পারে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে পরতে পরতে ঘাস চাপা দিয়ে ড্রাম ভর্তি করে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বাতাস বের করে মুখের কাছে ১০-১২ ইঞ্চি শুকনা খড় বিছিয়ে এর মুখ খুব ভাল ভাবে এঁটে দিতে হবে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রথম দিন ড্রাম ভর্তি করে ঢাকনা দিয়ে আটকিয়ে দেয়ার ৫-৭ দিন পর আবার ঢাকনা খুললে দেখা যাবে যে, ঘাস ফার্মেন্টেশন (গাঁজন) হয়ে ড্রামের উপরের অংশে কিছুটা ফাঁকা হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আরো যতটা সম্ভব কাঁচা ঘাস পূর্ণ করে পূণরায় এর মুখ আটকিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে বাতাস প্রবেশ বন্ধে মুখটা সেলোটেপ দিয়ে ভালভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে তৈরীকৃত ড্রাম সাইলেজ ১ বছরেরও অধিক সময় সংরক্ষণ করা যাবে যদি সঠিক ভাবে ভেতরের বাতাস বের করে দেয়া যায়। কোন খামারী ইচ্ছা করলে এভাবে এক সাথে ২০-২৫ টি ড্রাম তৈরী করে বর্ষা/শীতকালে বাজারে বিক্রয় করে খালি ড্রামে আবার সাইলেজ তৈরী করতে পারবে। একটি ড্রাম সাধারনত ৮-১০ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে যদি যত্ন সহকারে ব্যবহার করা হয়।

ডোল সাইলেজ

আগেই বলা হয়েছে ডোল সাইলেজ হচ্ছে ডোলের মধ্যে সাইলেজ সংরক্ষণের একটি প্রক্রিয়া। তবে সাইলো তৈরীর খরচ, ব্যবহারের স্থায়িত্ব কাল ও গুনগত মান বিবেচনা করে দেখা গেছে যে, অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে ডোল পদ্ধতিটিই গ্রামিন খামারী পর্যায়ে সাশ্রয়ী পদ্ধতি। যেহেতু সাইলেজ বানানোর প্রক্রিয়াটি আগেই বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে সুতরাং এখানে শুধু ডোলের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আমাদের দেশের যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরী খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য ডোল পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিতে ৫০ কেজি থেকে ৭৫০ কেজি আকারের ডোল সাইলো তৈরী করতে পারেন। এ ধরনের ডোল সাইলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদি পশু না থাকলেও তিনি তার নিজস্ব জমিতে শুধু ঘাস উৎপাদন এবং ডোল সাইলো করে সংরক্ষিত সাইলেজ বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ডোল সাইলো অতি সহজেই পরিবহন করা যায়। মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরীর যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ডোল পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ডোল পরিপূর্ণ করার পর ভালভাব মুখ বেধে রাখতে হবে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসটিটিউট গবেষণা করে দেখেছে যে, ডোল পদ্ধতিতে সবুজ ঘাস এমনকি মেইজ স্টোভার (ভুট্টা গাছের মোথা) সাইলেজ করে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষন করে রাখা যায়। এখন আসা যাক ডোলে কিভাবে সাইলেজ রাখা হয়। এটা দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায় যথাঃ (১) হাট-বাজারে বাঁশের তৈরী ধান রাখার যে গোলাকার ডোল পাওয়া যায় সেটির ভেতরে পলিথিন মুড়িয়ে বায়ুরোধক করে (২) একই ডোলের ভেতরে পলিথিন মুড়িয়ে এবং বাহিরে মাটি, তুষ ও গোবরের প্রলেপ দিয়ে বায়ুরোধক করে। নীচে হাওড় অঞ্চলে প্রাপ্ত দেশি ঘাসের ডোল সাইলেজ পদ্ধতির কিছু ছবি দেয়া হলঃ

ডোলের ভেতর পলিথিন ব্যাগ

চাপ দিয়ে সাইলেজ ভরা

ডোলের মুখ ঢেকে দেয়া

এখন আসা যাক ডোল সাইলেজের পুষ্টিমান ও অন্যান্য বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুনগত মান নিয়ে আলোচনায়। নীচে বিএলআরআই উদ্ভাবিত ন্যাপিয়ার ঘাসের একটি ভ্যারাইটির সাইলেজ তৈরীর পূর্বের এবং ৩ ও ৬ মাস সংরক্ষনের পরের পুষ্টিমানের একটি তুলনামূলক চিত্র ৬.১ নং সারণীতে দেয়া হ'ল।

সারণী ৬.১ঃ সাইলেজ তৈরীর পূর্বে ও সাইলেজ সংরক্ষনের বিভিন্ন মেয়াদে পুষ্টিমান

ক্র. নং	পুষ্টি উপাদান (%)	সাইলেজ তৈরীর পূর্বে	সংরক্ষনের ৩ মাস পরে	সংরক্ষনের ৬ মাস পরে
০১	শুষ্ক উপাদান	১৭.০০	১৭.৮৩	২০.০৬
০২	জৈব উপাদান	৯০.১৪	৮৮.০০	৮৯.০০
০৩	অশোধিত আমিষ	০৯.৩৫	১১.৫০	১১.৯২
০৪	খনিজ পদার্থ	০৯.৮৬	১১.০৮	১০.১৭

উপরের ৬.১ নং সারণীতে এ দেখা যাচ্ছে যে, পুষ্টিমানের সূচক গুলোর মধ্যে অধিকাংশই সাইলেজ তৈরী পরবর্তি পর্যায়েই উর্ধ্বমূখী। আরো লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে সাইলেজ সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলেও পুষ্টিমানের কোন অবনতি ঘটেনা বরং সংরক্ষণে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কিছু গুণাবলী বৃদ্ধি পায়।

উপরের সারণীতে সাইলেজের গুণাবলী সমূহ বিএলআরআই'র গবেষণা খামারে নিবিড় তত্ত্বাবধানে সংঘটিত প্রাপ্ত ফলাফল। এখন দেখা যাক মাঠ পর্যায়ে কৃষকের খামারে কেমন ফলাফল পাওয়া যায়। এটা পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশের তিনটি জেলা যথাঃ দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ এ কিছু খামারী বাছাই করে সেখানে সাইলেজ তৈরী, সংরক্ষণ, গুণাবলী যাচাই এবং গবাদি প্রাণীতে তার উপযোগীতা যাচাই করা হয়েছে। নীচের ৬.২ নং সারণীতে ৩ মাস সংক্ষিত সাইলেজের বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণাবলী দেখানো হ'লঃ

সারণী ৬.২ঃ সাইলেজ সংরক্ষনের বিভিন্ন মেয়াদে গুনগত বৈশিষ্ট্যাবলী (মাঠ পর্যায়ে)

ক্র. নং	বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলী	দিনাজপুর	সিরাজগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
০১	রং	হলুদাভ	হলুদাভ	হলুদাভ
০২	গন্ধ	মিষ্টি অম্লীয়	মিষ্টি অম্লীয়	মিষ্টি অম্লীয়
০৩	পঁচনক্রিয়া	প্রায় ১-২% (উপরে)	প্রায় ১-৩% (উপরে)	প্রায় ৫% (উপরে)
০৪	ইস্ট/মোল্ড	সামান্য	খুবই কম	কিছুটা
০৫	পি.এইচ (pH)	৬.১২	৬.২৪	৬.০৫
০৬	সার্বিক মন্তব্য (গ্রহনযোগ্যতা)	ভাল	ভাল	মোটামুটি

উপরের ৬.২ নং সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, সাইলেজের বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণাবলী সংরক্ষণের পরেও ভাল থাকে এমনকি সংরক্ষণের মেয়াদ দীর্ঘায়িত হলেও বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণাবলীর খুব একটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়না যদিও পঁচনক্রিয়া আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। মাঠ পর্যায়ে ৩ মাসে সংরক্ষিত সাইলেজের গুণগত মানের সাথে গবেষণা খামারে সংরক্ষিত সাইলেজের তেমন তাৎপর্য পার্থক্য নেই। নিম্নের পরবর্তি ৬.৩ নং সারণীতে সংরক্ষিত সাইলেজের পুষ্টিমান দেয়া হ'লঃ যাতে এও দেখা যাচ্ছে যে, ৩ মাস সংরক্ষিত সাইলেজের পুষ্টিমানে গবেষণা খামার ও মাঠ পর্যায়ে তেমন কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই। উল্লেখ্য যে, মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষিত সাইলেজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ছাড়াও দুগ্ধবতি গাভীতে সাইলেজ খাইয়ে তার প্রভাবও পরীক্ষণ করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, খামারিদের প্রচলিত সাধারন খাদ্য খাইয়ে দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন যেখানে ৮ কেজির মত, সেখানে সাইলেজ খাইয়ে গড় দুধ উৎপাদন পাওয়া গেছে ১০ কেজির মত।

সারণী ৬.৩ঃ মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষিত সাইলেজের পুষ্টিমান

ক্র. নং	পুষ্টি গুণাগুন	দিনাজপুর	সিরাজগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
০১	শুষ্ক উপাদান (%)	১৭.৫০	১৬.৮৫	১৫.৯০
০২	জৈব উপাদান (%)	৮৮.২৫	৮৮.৯৫	৮৭.৪৫
০৩	অশোধিত আমিষ (%)	১০.২০	১০.৪৫	৯.৮৭
০৪	খনিজ পদার্থ (%)	১১.৫৬	১১.৭৫	১১.২০
০৫	এডিএফ (%)	৪৬.৫০	৪৬.৬৫	৪৫.৬২

ডোল সাইলেজের আর্থিক মূল্যায়ন

নীচের ৬.৪ নং সারণীতে সাইলেজ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেমন খরচ হয় এবং কোন পদ্ধতি সাশ্রয়ী তা দেয়া হ'ল, যাতে সাধারণ খামারীরা সাইলেজ তৈরী ও তা সংরক্ষণ সম্পর্কে পূর্ণ ধারনা লাভ করতে পারে।

সারণী ৬.৪ঃ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাইলেজ সংরক্ষনের তুলনামূলক খরচ

খরচের খাত সমূহ	সাইলেজের ধরন		
	পলিব্যাগ	ডোল	ড্রাম
ঘাসের পরিমান (কেজি)	৪০০	৭৫০	৫৫
প্রতি কেজির উৎপাদন মূল্য ০.৭৫ টাকা হিসাবে ঘাসের মূল্য (টাকা)	৩০০	৫৬০	৪০
শ্রমিক খরচ (টাকা)	৩০০	৪০০	১০০
ম্যাটেরিয়াল ক্রয় খরচ (টাকা)	৩২৫	১৫২৫	৫০০
মোট খরচ (টাকা)	৯২৫	২৪৮৫	৬৪০
১ বার তৈরীতে প্রতি কেজির সংরক্ষণ খরচ (টাকা)	২.৩০	৩.৩০	১১.৬৪
স্থায়ীত্ব কাল (বার/বছর)	১ বার	৩ বছর	১০ বছর

* উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ১ বার সাইলেজ তৈরী না করে বিভিন্ন পদ্ধতির স্থায়ীত্ব কাল বিবেচনায় প্রতি কেজি সাইলেজের উৎপাদন খরচ কমে হবে ডোল পদ্ধতিতে প্রায় ২ টাকা এবং ড্রাম পদ্ধতিতে প্রায় ৩ টাকা।

এখন দেখা যাক একটি খামারী সাইলেজের পরিবর্তে শুকনা খড় ব্যবহার করলে উৎপাদন খরচের কি পরিবর্তন হয়। ধরা যাক, একটি খামারী একটি দেশী গাভী পালন করছেন যেটি সবেমাত্র বাচ্চা দিয়েছে এবং প্রত্যহ ২ কেজি করে দুধ দিচ্ছে। কিন্তু তখন কাঁচা ঘাসের সংকট কালিন শুরু হওয়ায় তাকে সাইলেজ খাওয়াতে হচ্ছে। খামারীর এক ডোল পরিমান সাইলেজ মজুত আছে যার পরিমান প্রায় ৭৫০ কেজি। প্রত্যহ গাভীর সঠিক চাহিদা মাফিক সাইলেজ সরবরাহ করলে গাভীটিকে দৈনিক ১৫ কেজি সাইলেজ সরবরাহ করতে হবে (সাথে পরিমান মত দানাদার মিশ্রন) যার ফলে সে তার মজুতকৃত সাইলেজ প্রায় ৫০ দিন চালাতে পারবে এবং এই ৫০ দিনে তাকে শুধুমাত্র সাইলেজের জন্য প্রায় ১৫০০.০ টাকা খরচ করতে হবে। এখন যদি ঐ খামারী সাইলেজ না খাইয়ে শুকনা খড় (সাথে দানাদার মিশ্রণ পরিমান মত) খাওয়ায় তবে গাভীটির দৈনিক রাফেজের চাহিদা পূরণ করতে প্রত্যহ তাকে ৪ কেজি করে শুকনা খড় সরবরাহ করতে হবে এবং ৫০ দিনে মোট ২০০ কেজি খড় বাবদ প্রতি কেজি খড়ের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০ টাকা হিসাবে ২০০০ টাকা খরচ হবে। এছাড়াও আর একটি খরচ হবে যা হিসাবের মধ্যে যুক্ত হবে সেটি হচ্ছে দুধের উৎপাদন কমে যাওয়া। আমরা জানি শুকনা খড়ের মধ্যে পুষ্টি উপাদান খুবই কম। সেটি শুধু গরুর পেটই ভড়ায় কিন্তু অনেক পুষ্টিরই ঘাটতি থাকে, যার ফলে কাংখিত দুধ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয়না। দেখা যায় শুধুমাত্র খড়ভিত্তিক গবাদীপশু পালনে দুধের উৎপাদন সুষম খাদ্য যুক্ত গাভীর চেয়ে ২০-২৫ ভাগ কমে যায়। সে হিসাবে উক্ত খামারী প্রতিদিন আধা কেজি করে দুধ কম পেলে ৫০ দিনে ২৫ কেজি দুধ কম পাবে যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রতি কেজি ৬০ টাকা হিসাবে প্রায় ১৫০০ টাকা। সুতরাং খামারির ৫০ দিনে মোট খরচ হবে প্রায় ৩৫০০.০ টাকা যা সাইলেজ ভিত্তিক খাদ্যের চেয়ে ২০০০.০ টাকা বেশী এবং সেটা শুধুমাত্র ৫০ দিনের জন্য। কিন্তু, মোট দুধ উৎপাদন কাল ৬-৭ মাস হলে খড়ভিত্তিক খাদ্য খরচ অনেক বেড়ে যাবে, যা আমরা অনেকেই ভেবে দেখিনা। সুতরাং লাভজনক ভাবে গবাদী পশু পালন করতে সাইলেজ খাওয়ানো অত্যাবশ্যক এবং ডোল সাইলেজ একটি খামারীবান্ধব খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি।

প্রয়োজনে সাইলেজে এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ সংযোজন

পুর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কাঁচাঘাস টুকরো টুকরো করে কেটে তার আর্দ্রতা ঠিক রেখে কোন কিছু সংযোজন ছাড়াই বায়ুরোধক অবস্থায় সাইলেজ সংরক্ষণ করা যায়। আবার এতে লালীগুড়ও সংযোজন করা যায়। উল্লেখ্য যে, লালীগুড় সাইলেজে পুষ্টি সংযোজনের পাশাপাশি সংরক্ষক (প্রিজারভেটিভ) হিসাবেও কাজ করে। সাইলেজে প্রিজারভেটিভ এর ব্যবহার পূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সাইলেজে প্রিজারভেটিভ এর ব্যবহার এখানে শুধুমাত্র সংক্ষেপে দেয়া হলঃ

(১) পুষ্টি উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটে।

(২) গাঁজনযোগ্য শর্করার সংমিশ্রনে ভালভাবে গাঁজন ঘটে।

(৩) জৈব এসিড যুক্ত হয়ে অনাকাংখিত মোল্ড বা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে।

(৪) সরাসরি বা আংশিক অক্সিজেন হ্রাস করে।

(৫) সাইলেজের আর্দ্রতা হ্রাস ।

(৬) দীর্ঘদিন সংরক্ষণে সহায়তা করে ।

(৭) নাইট্রোজেনের পরিমান বৃদ্ধি করে ।

(৮) গলিত পদার্থ হিসেবে যে এসিড বেরিয়ে যায় তার সংমিশ্রণ ঘটে ।

কয়েকটি এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভের নাম (ছবি সহ)

১। নালীগুড় ঃ ৩-৪ % হারে ।

২। ইউরিয়া ঃ ০.৫% হারে ।

৩। লাইমস্টোন ঃ ০.৫-১% হারে ।

৪। জৈব এসিড ঃ ১% হারে ।

৫। ব্যাক্টেরিয়াল কালচারঃ প্রয়োজন মত ।

নালীগুড়

ইউরিয়া

লাইমস্টোন (চুনাপাথর)

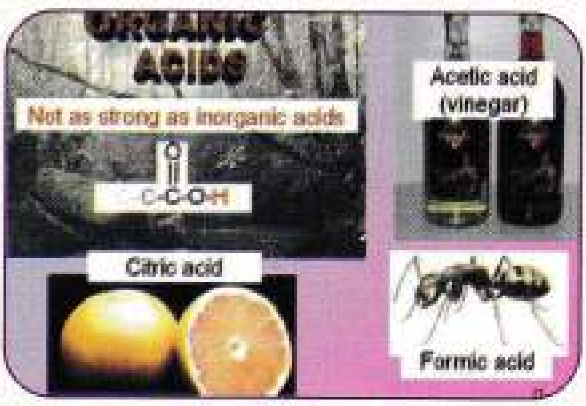

জৈব এসিড

ব্যাকটেরিয়াল কালচার

সাইলেজ তৈরীর সময় যে বিষয় খেয়াল রাখা উচিত

১। সাইলেজ তৈরীর জন্য ঘাসে অবশ্যই ৩০-৩৫ শতাংশ শুষ্কপদার্থ (ড্রাইমেটার) থাকা প্রয়োজন ।

২। নীচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না ।

৩। উপরের পলিথিন সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি "সাইলেজ" এর ভিতরে প্রবেশ না করে ।

৪। চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে অর্থাৎ এমনভাবে দ্রবণ তৈরী করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে ।

৫। ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায় । বিশেষ করে, সাইলোর কোনাগুলো এবং পাশসমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে ।

৬। গরু, বাছুর, শেয়াল যাতে উপরের পলিথিন নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে ।

ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য

১। সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ

২। গন্ধ আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ

৩। পিএইচ ৩.৫-৪.৫

ভাল সাইলেজের রং (হলুদাভ সবুজ)

গন্ধ শুকে গরুর সাইলেজ খাওয়া

সাইলেজ খাওয়ানো

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্কপদার্থ গ্রহন করে থাকে। দুধাল গাভী প্রতিদিন কি পরিমান দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় কোন কোন বিজ্ঞানী দেখেছেন যে, যেখানে সাইলেজ একক রাফেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমান সাইলেজ গ্রহন করে থাকে। সাইলেজ এর সংগে কাঁচা ঘাস অথবা শুকনা খড়ও একত্রে মিশিয়ে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাঁচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

গবাদি প্রাণির নাইট্রেট বিষক্রিয়া

নাইট্রেট বিষক্রিয়া গবাদি পশুর কোন রোগ নয়। এটি এক প্রকার বিপাকীয় ত্রুটি। গবাদি পশু কাঁচা ঘাস খাওয়া থেকে অনেক সময় বিষক্রিয়া দেখা যায় যাকে নাইট্রেট বিষক্রিয়া বা নাইট্রেট পয়জনিং বলা হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের মধ্যে ঘাস অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। লাভজনক দুগ্ধ খামারের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভাল ঘাসের মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থ প্রচুর পরিমানে থাকে। এগুলো সহজেই পরিপাক হয় ও পশুর স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কিন্তু, অনেক সময় দেখা যায় কিছু ঘাস খাওয়ানোর ফলে গবাদিপশুতে বিভিন্ন ধরণের লক্ষণ দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারাও যায়। তাই ঘাস খাওয়ানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এইরকম কিছু বিষক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ক) নাইট্রেট বিষক্রিয়া খ) সায়নাইড বিষক্রিয়া গ) অক্সালেট বিষক্রিয়া ঘ) প্রুসিক এসিড বিষক্রিয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশে প্রতি বছর বহুসংখ্যক গবাদিপশু নাইট্রেট বিষক্রিয়ায় মারা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ঘাসে অল্প পরিমান নাইট্রেট থাকে। তবে ঘাসে ১.৫% এর অধিক নাইট্রেট থাকলে তা প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশে প্রাণিখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন ঘাস ও লতা পাতার মধ্যে নেপিয়ার, হেলেঞ্চা, মুলা, সয়াবিন, যব, সরিষা, ভুট্টা, জোয়ার, সুদান ঘাস, আখ, গম, শালগম, পাতাকপি, শশা ইত্যাদি উদ্ভিদে নাইট্রেটের পরিমান বেশি থাকে, ফলে এই সকল ঘাস- পাতা অধিক পরিমানে খাওয়ানো বিপদজনক।

নাইট্রেট বিষক্রিয়ার কারণ সমূহ

বাহ্যিক কারণ সমূহ :

- নীচু জলাভুমি।
- অতিরিক্ত পরিমানে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ব্যবহারের কারণে।
- দীর্ঘদিনের খড়ার পরে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হলে।
- দ্রুত বর্ধনশীল অপরিপক্ক ঘাস।

অভ্যন্তরীণ কারণ সমূহঃ

- দুর্বল পশু।
- কম দানাদার যুক্ত খাবার খাওয়ালে অথবা শুধু রাফেজ খাওয়ালে।
- নিম্নমানের খাবার খাওয়ালে।
- নাইট্রেটযুক্ত অধিক খাবার স্বল্প সময়ের মধ্যে খাওয়ালে।
- কলিজায় কোন রোগ থাকিলে।

ঘাসে অধিক নাইট্রেটের কারণসমূহ

- দীর্ঘস্থায়ী খরার পর বৃষ্টি।
- অত্যধিক গরম বা ঠান্ডা আবহাওয়া।
- ঘন কুয়াশা।
- দীর্ঘস্থায়ী মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া।
- জমিতে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার।

নাইট্রেট বিষক্রিয়া পদ্ধতি

পশুর শরীরে নাইট্রেট যে ভাবে পশুর বিষক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যা সৃষ্টি করে তা সংক্ষেপে নিম্নরুপ-

নাইট্রেট

↓

গ্যাসট্রোইনটেসটাইনাল ট্রাক্ট

↓

নাইট্রেট রক্তে শোষিত হয়ে নাইট্রাইট গঠন করে

↓

রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে মিথেমোগ্লোবিনে রুপান্তরিত হয়

↓

মিথেমোগ্লোবিন দেহে অক্সিজেন পরিবহনে বাধাগ্রস্থ করে

উল্লেখ্য যে, নাইট্রেট বিষক্রিয়ায় রক্তের ৬০-৮০% হিমোগ্লোবিন মেথিমোগ্লোবিনে পরিনত হয়। নাইট্রাইট রক্ত নালীর প্রসারতা বাড়িয়ে রক্তচাপ কমিয়ে দেয়।

লক্ষণসমূহ

মৃদু বিষক্রিয়ায় যে লক্ষণ সমূহ দেখা যায় তা হচ্ছেঃ

- অতিরিক্ত নাইট্রেটযুক্ত ঘাস খাওয়ার ফলে লালা ক্ষরণ।
- প্রাণীর ক্ষুধামন্দা/খাদ্যে অরুচি ভাব দেখা যাবে।
- পেশীর কম্পন, টলতে টলতে চলা বা দাঁড়ানো।
- বাছুরের দুর্বলতা দেখা দিবে।
- প্রাণীর দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ও হাঁপানোসহ শ্বাসকষ্ট দেখা দিবে।
- পুনঃ পুনঃ প্রসাব ত্যাগ করে ও গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভপাত ঘটবে।
- প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধি সীমিত হয়ে যাবে।

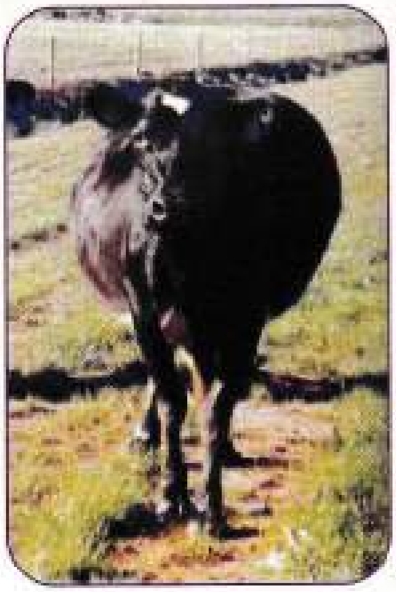

মৃদু বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত গরু

তীব্র বিষক্রিয়ায় যে লক্ষণ সমূহ দেখা যায় তা হচ্ছেঃ

- দেহের তাপ স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে থাকতে পারে।
- প্রাণীর তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দিবে।
- প্রাণীর পেট ব্যথা, ডায়রিয়া ও বমি দেখা দিবে।
- প্রাণীর স্নায়ুবিক দুর্বলতা দেখা দিবে।
- প্রাণীর অনৈচ্ছিক স্পন্দন ও খিঁচুনি শুরু হবে।
- তীব্র সায়ানোসিস ও পরে মিউকোসা পান্ডুবর্ণ, দ্রুত ও দুর্বল নাড়ীর গতি পরিলক্ষিত হয়।
- প্রাণীর চোখ নীলাভ বর্ণ ধারণ করবে।
- আক্রান্ত প্রাণী মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে।

তীব্র বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত মৃত গরু

নাইট্রেট বিষক্রিয়ায় মৃত পশুর ময়নাতদন্ত

- জমাট ছাড়া চকোলেট বা গাড় বাদামী রং এর রক্ত পাওয়া যাবে।
- বিন্দু বিন্দু রক্ত দাগ থাকবে ফুসফুস,কলিজা এবং বৃক্কে।
- নীলাভ আভা থাকবে মিউকাস মেমব্রেনে।

রোগ নির্ণয়ঃ

- সন্দেহমূলক নতুন ঘাস খাওয়ার ইতিহাস শুনে।
- বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ (ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্ট, পেশীর কম্পন ও খিঁচুনি এবং দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা হ্রাস)।
- গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে।

নাইট্রেট বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত প্রাণীর চিকিৎসা

- ১% মিথিলিন ব্লু ৮.৮মিলিগ্রাম/ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য শিরায় ইনজেকশন করতে হবে ৬-৮ ঘন্টা পরপর।
- ডেক্সট্রোজ-স্যালাইন শিরায় ইনজেকশান করতে হবে।
- এট্রোপিন গরুতে ৬ মিলি এবং ছাগলে ২-৩ মিলি মাংসে প্রয়োগ করতে হবে।

নাইট্রেট বিষক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

- সাইলেজ ৫০% পর্যন্ত ঝুঁকি কমায়।
- দীর্ঘস্থায়ী খরার পর নতুন ঘাস না খাওয়ানো।
- কাঁচা ঘাসের সাথে খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যায়।
- পরিপক্ক ঘাস খাওয়াতে হবে।
- নাইট্রোজেন যুক্ত সার পরিমাণ মত ছিটাতে হবে।
- সুষম খাবার দিতে হবে।
- নাইট্রেটযুক্ত ঘাস খাওয়ানোর ক্ষেত্রে ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন (৩০ মিলিগ্রাম/ কেজি খাদ্য) খাওয়ালে নাইট্রেট থেকে নাইট্রাইটে রুপান্তর হ্রাস পায়।

হে

প্রাণী খাদ্য সংরক্ষণের উপায় হিসেবে 'হে' তৈরীকরণ একটি উৎকৃষ্টতম পন্থা। অতি প্রাচীনকাল থেকে পশু খাদ্য হিসেবে 'হে' বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে 'হে' তৈরী ব্যাপকভাবে প্রচলন না থাকলেও কিছু কিছু এলাকায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে খামারীরা ব্যবহার করে আসছেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে কাঁচা ঘাসের সহজলভ্যতা সমান না হওয়ায় যে সকল ঋতুতে কাঁচা ঘাস বিশেষ করে লিগুম জাতীয় ঘাস সহজেই পাওয়া যায় সে সকল কাঁচা ঘাস 'হে' তৈরী করে খামারীরা সংকটকালীন সময়ে ব্যবহার করতে পারেন।

হে বেল

ভাল হে-র রং

উন্নত মানের 'হে' দেখতে সবুজ রঙের, পাতাযুক্ত, সহজেই হজমযোগ্য এবং যে কোন ধরনের ছত্রাক আক্রান্ত থেকে মুক্ত থাকবে। 'হে' তৈরী করার সময় ঘাসের বয়স বা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে কর্তন করা উচিৎ। উৎকৃষ্ট মাণের হে তৈরী করার জন্য ঘাসে যখন ফুল আসে তখন কর্তন করা উচিৎ। ফসল ফুল আসা অবস্থায় কর্তন করে 'হে' প্রস্তুত করলে উহার গুণগত ও পুষ্টিমান ভাল হবে এবং এ জাতীয় 'হে' কে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

'হে' তৈরীর মূলনীতি

হে তৈরীর মূলনীতি হলো ঘাসের ফসলের মধ্যে রক্ষিত পানির পরিমানকে কমিয়ে এনে এমন ভাবে 'হে' তৈরী করতে হবে যাতে হে-র মধ্যে গাঁজন না ঘটে এবং প্রস্তুতকৃত হে কে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। "হে" শুকানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি হে এর উপর না পড়ে এবং যাতে ঘাস থেকে অধিক হারে পাতা ঝড়ে না পড়ে যায়। সঠিকভাবে শুকানো "হে" দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী সহ অন্যান্য পশুসম্পদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য, বিশেষ করে যে সমস্ত ঋতুতে কাঁচা ঘাসের অভাব বিদ্যমান থাকে। কাঁচা ঘাসের পরিপূরক বা বিকল্প হিসেবে শুষ্ক 'হে' গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে পাকস্থলি পরিপূর্ণ রাখতে এবং উহার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

উন্নত মানের 'হে' তৈরীর শর্তাবলীঃ

(১) ভাল মানের 'হে' তে অবশ্যই অধিক পাতাযুক্ত থাকবে। 'হে' অধিক পাতাযুক্ত হলে উহার খাদ্যমান অধিক হবে। পাতায় সাধারণতঃ অধিক পরিমানে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে বিধায়, 'হে' তৈরীর সময় অধিক পাতা ঝড়ে গেলে 'হে' এর গুণগতমান নষ্ঠ হয়ে যায়।

(২) 'হে' তৈরীর জন্য ঘাস অবশ্যই ফুল ধরার সময় কাটিতে হবে, যাতে অধিক পরিমান পুষ্টি উপাদান 'হে' এর মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হয়। ফল ধরার সময় ঘাস কর্তন করলে "হে" এর পুষ্টিমান অনেকটা ফলের দানার মধ্যে চলে যায় এবং ফলে উহার পুষ্টিমান কমে যায়।

(৩) 'হে' এর রং সবুজ থাকবে যাতে 'হে' এর পাতায় অধিক হারে কেরোটিনের পরিমান বিদ্যমান থাকে।

(৪) 'হে' অবশ্যই নরম ও সহজেই হজমযোগ্য হতে হবে।

(৫) 'হে' অন্য কোন অর্বজনা কিংবা ছত্রাক মুক্ত হতে হবে।

(৬) 'হে' অবশ্যই আগাছা মুক্ত এবং অন্যান্য ময়লা মুক্ত হতে হবে।

(৭) 'হে' এর নিজস্ব এ্যারোমেটিক এবং সুগন্ধ হতে হবে।

(৮) 'হে' এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে তৈরীকৃত 'হে' এর মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ কিংবা তার চেয়ে কম পরিমান পানি থাকবে। সাধারণতঃ ফসলের পুষ্টিমানের উপর 'হে' এর পুষ্টিমান নির্ভর করে। তবে দেখা যায় যে, 'হে' এর মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ আঁশ এবং ৪৫-৬০ ভাগ মোট পরিপাচ্য পুষ্টি উপাদান থাকে।

'হে' এর প্রকার ভেদ

(১) **শীমজাতীয় 'হে'ঃ** খেসারী, মাটিকালাই, কাউপি, আলফা আলফা, প্রভৃতি শুকিয়ে যে হে তৈরী করা হয় তাকে শীমজাতীয় (লেগুম) হে বলে। শীমজাতীয় 'হে' এর মধ্যে অধিক পরিমান আমিষ, ভিটামিন এমনকি ভিটামিন ডি এর পরিমাণ বেশী থাকে। তাছাড়া, এ জাতীয় 'হে' এর মধ্যে ক্যালসিয়ামের আধিক্য থাকে এবং ইহা গবাদি প্রাণীর জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি এবং ভিটামিন এ এর আধিক্য ছাড়াও শীমজাতীয় 'হে' এর মধ্যে ভিটামিন ই এর পরিমাণও বেশী থাকে।

(২) **নন-লিগুমিনাস হেঃ** লেগুমিনাস 'হে' এর তুলনায় নন-লেগুমিনাস হে তে পুষ্টিমান সাধারণতঃ কম থাকে। তবে নন-লেগুমিনাস হে এর একটাই সুবিধা এগুলো লেগুমিনাস 'হে' এর তুলনায় অধিক পরিমানে উৎপাদন করা যায়। নন-লেগুমিনাস 'হে' তৈরী করতে যে সমস্ত ফসল ব্যবহার করা হয়, তন্মধ্যে ওট, বার্লি, ট্রিটিক্যালি এর নাম উল্লেখযোগ্য। নন-লেগুমিনাস 'হে' তে প্রোটিন ও ভিটামিনের তুলনায় শেতসার জাতীয় পুষ্টিমানের পরিমান বেশী থাকে।

(৩) **মিশ্র হেঃ** লেগুমিনাস এবং ননলিগুমিনাস ফসলের সমন্বয়ে যে হে তৈরী হয়, তাকে মিশ্র হে বলে। এই জাতীয় মিশ্র 'হে' এর পুষ্টিমান নির্ভর করে দুই ফসলের মিশ্ররের অনুপাতের উপর। তাছাড়া, নন-লেগুমিনাস ও লেগুমিনাস ফসলের কর্তনের সময়ের তারতম্য হওয়ার কারণে পুষ্টিমানেরও তারতম্য হতে দেখা যায়। যদি নন-লেগুমিনাস ফসলকে ফল আসার আগে কর্তন করা হয়, তখন এ জাতীয় হে তে প্রোটিনের পরিমান বেশী থাকে।

'হে' তৈরীর জন্য ফসলের কর্তন সময়

'হে' তৈরীর জন্য ফসলের কর্তন সময় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভাল মানের 'হে' তৈরীর জন্য ফসলকে অবশ্যই দিনের বেলায় ঘাস থেকে শিশির শুকিয়ে গেলে কর্তন করতে হবে যাতে কর্তন করার পর ফসলকে সমানভাবে ক্ষেতের মধ্যে ছিটিয়ে দেয়া যায় এবং সমানভাবে রোদের তাপ পড়ে। ঘাস কর্তন করার সময় আর একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যেন ক্ষেত ভিজা না থাকে। ক্ষেত ভিজা থাকলে কর্তনকৃত ফসলকে সমানভাবে রোদে শুকানো সম্ভব হবে না। আর একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার তা হচ্ছে ফসল অতিরিক্ত পরিপূর্ণতা হওয়ার আগেই কর্তন করা। অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ ফসলের ফুল আসা অবস্থায় কর্তন করলে উহা দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের 'হে' তৈরী করা সম্ভব।

কিউরিং অব 'হে'

'হে' তৈরীর সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত রোদে 'হে' এর কোন ক্ষতি না হয় এবং রোদে নাড়া-চাড়া করার সময় পাতা কম ঝড়ে পড়ে। তাছাড়া এমনভাবে রোদে শুকাতে হবে যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ পানি বের হয়ে যায় এবং 'হে' সংরক্ষণ করার পর কোন রকম তাপমাত্রার বৃদ্ধি না ঘটে ও পরবর্তীকালে পুষ্টিমান অপচয় কম হয়। 'হে' তৈরীর জন্য ফসলকে কর্তন করার

পর তা মাঠের মধ্যেই বিছিয়ে রাখতে হবে যাতে এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ শুকিয়ে যায়। রোদে শুকানোর পর আচড়া দিয়ে ছোট ছোট স্তুপ করতে হবে। আবহাওয়া ভাল থাকতে 'হে'-র ছোট ছোট স্তুপগুলো কিছু সময়ের জন্য ওলট-পালট করে দিতে হবে যাতে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ফিল্ড কিউরিং বলে।

তাছাড়া, কৃত্রিম ভাবেও 'হে' কে শুকানো যায়। এ পদ্ধতিতে 'হে' এর তৈরীকৃত একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে চালনা করা হয়, যার মধ্যে গরম বাতাস প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা থাকে। গ্রীষ্মকালীন সময়ে 'হে' তৈরীর জন্য প্রস্তুত হলে সকাল বেলার রোদে ফসলকে শুকানো হবে এবং এতে পাতার অপচয় কম হবে। অধিক তাপমাত্রায় ফসলকে রোদে শুকালে, পাতা অতি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং এতে পাতা অপচয় বেশী হয় ও 'হে' এর পুষ্টিমান কমে যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'হে' কে গাঁজন এর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এবং অধিক সময় পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতার পরিমান শতকরা ২০ ভাগের কম থাকতে হবে।

'হে' তৈরীর সময় পুষ্টিমানের অপচয়

'হে' তৈরীর সময় কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু উপযুক্ত সময় ও অবস্থায় 'হে' তৈরী করলে এই অপচয়ের পরিমান কম হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাধারণ তাপমাত্রায় 'হে' তৈরী করলেও উহার পরিপাচ্যতা কমে যায়। তাছাড়া, ফসলকে ব্যতিরেকে সংরক্ষণ করলে 'হে' এর উৎকৃষ্টতা বজায় থাকে। সাধারণতঃ চারটি ভাগে 'হে' এর পুষ্টিমান নষ্ট হয়ে থাকে। যেমনঃ

(১) ফসলকে অতি বয়স্ক অবস্থায় কর্তন করলে।

(২) নাড়া-চাড়া অধিক হলে পাতার অপচয় বেশী হয়।

(৩) ফার্মেন্টেশন এবং অধিক ভিটামিনের অপচয় বেশী হয়।

(৪) বৃষ্টির সময় 'হে' মাঠে থাকলে দ্রবণীয় পুষ্টি উপাদানের অপচয় হয়।

'হে' তৈরী ও সংরক্ষণের সময় জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন

'হে' তৈরীর জন্য ফসল কর্তনের পর হঠাৎ করে প্রশ্বেদন (গাছের শেকড় থেকে পাতায় পানি পরিবহন) প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার কারণে গাছের পাতা অতি সহজেই নেতিয়ে পড়ে এবং পাতা শুষ্ক হয়ে যায়। ফসল শুকানোর পর গাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে জড়িত এনজাইমগুলোর কার্যকারীতা বন্ধ থাকার কারণে অনেক পুষ্টি উপাদনের অক্সিডেসন (জারণ) ঘটে থাকে। এ প্রক্রিয়া 'হে' হিসাবে সংরক্ষণ করার পরও ঘটতে পারে। 'হে' তৈরী সময় যে সমস্ত জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে থাকে তা নিম্নরূপঃ

(ক) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তনঃ শ্বেতসার জাতীয় উপাদানের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান অতি সহজেই পানিতে দ্রবণীয় উহা অতি সহজেই কার্বন-ডাই অক্সাইড ও পানিতে অক্সাইড উপ-জাত হিসেবে নির্গমন ঘটে ফলে তাপ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এতে 'হে' শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ কমে যায়। শ্বেতসার জাতীয় উপাদনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ। এ ছাড়াও কিছু কিছু জৈব এসিড যেমনঃ ম্যালিক এসিড, সাইট্রিক এসিড এবং সাক্সিনিক এসিডেরও পরিবর্তন ঘটে।

(খ) নাইট্রোজেনাস খাদ্য উপাদানঃ 'হে' তৈরীর সময় নাইট্রোজেনাস পদার্থের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না। প্রোটিনেজ এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে অনেক সময় নন প্রোটিন নাইট্রোজেনের পরিমান বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া, ফসলের মধ্যে কোন বিষ জাতীয় পদার্থ থাকলে সূর্যের তাপে উহার কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যায়, বিশেষ করে যে সমস্ত ঘাসের মধ্যে হাইড্রোসায়ানিক এসিড থাকে।

(গ) ভিটামিন জাতীয় উপাদানঃ 'হে' তৈরীর সময় ভিটামিন জাতীয় উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে যে উপাদানটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা হলো ক্যারোটিন। কেরোটিনের প্রায় ৮০ ভাগই নষ্ট হয়ে যায়, যায় উল্লেখযোগ্য কারণ হলো লাইবোক্সিডেজ এনজাইমের উপস্থিতি। কিন্তু 'হে' তৈরীর সময়কে সংক্ষিপ্ত করলে এই অপচয়ের পরিমাণ কম হয়। তাছাড়া 'হে' এর মধ্যে ভিটামিন-ই এর পরিমাণ কমে যায়, কিন্তু সূর্য তাপের আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির উপস্থিতে আরগোস্টেরল আরগোক্যালসিফেরল এ রূপান্তরিত হওয়ার কারণে ভিটামিন-ডি এর পরিমাণ বেড়ে যায়।

'হে' সংরক্ষণ

'হে' প্রস্তুত করার পর শুকনা জায়গায় পালা দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। অথবা ঘরের মধ্যেও হে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। 'হে' কে পালা দিয়ে সংরক্ষণ করলে, ছায়াযুক্ত স্থান নির্বাচন পূর্বক পালা দিতে হবে। তাছাড়া, উন্নত পদ্ধতিতেও 'হে' কে সংরক্ষণ করা যায়, যেমন- বেল তৈরী করা। 'হে' কে বেল তৈরী করে সংরক্ষণ করলে জায়গা কম লাগে এবং অতি সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহন করা যায়।

মডিউল-৭
খাদ্য শস্যের উপ-জাত প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

আলোচিত বিষয় সমূহ

৭.১. খড় প্রক্রিয়াকরণ বা খড় সংরক্ষণ সমন্ধে পরিচিতি

৭.২. ভুট্টার খড় (মেইজ স্টোভার) প্রক্রিয়াকরণ বা সংরক্ষণ প্রণালী

৭.৩. শস্য-উপজাত দিয়ে টি.এম.আর. বা পরিপূর্ণ খাদ্য মিশ্রণ তৈরী করণ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাথমিক ধারনা পাবে:

- খড় ও মেইজ স্টোভারের পুষ্টিমান এবং কেন প্রক্রিয়াকরণ করা হয় সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।
- প্রক্রিয়াকরণ খড় ও মেইজ স্টোভার কিভাবে ব্যবহার করা হয় এবং প্রাণী উৎপাদনে এর ভূমিকা সমঙ্গে জানতে পারবে।
- ইউএমএস এর সাথে অন্যান্য যেমন কাঁচা বা অন্যান্য খড় প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সমঙ্গে ধারনা পাবে।
- শস্য-উপজাত ব্যবহার করে কিভাবে কম খরচে সুষম রশদ তৈরী করতে হয় তা জানতে পারবে।

৬.৩ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব

- প্রশিক্ষক খামারিদের কাছ থেকে বছরের কোন সময় কোন কোন শস্য-উপজাত পাওয়া যায় তার তালিকা নিবেন।

খড় প্রক্রিয়াকরণ (ইউএমএস) ও ব্যবহার

পশু খাদ্য সংকট গবাদি পশু উন্নয়নের একটি অন্তরায়। আমাদের দেশে গো-চারণ ভূমির অভাব অত্যন্ত প্রকট এবং দিনের পর দিন লাগামহীম জনসংখ্যার চাপে এ সংকট প্রকট থেকে আরও প্রকটতর হয়ে উঠেছে। পশু খাদ্য হতে পুষ্টিমান বাড়ানোর নিশ্চয়তা বিধান করার মাধ্যমে পশু রোগ দমন ও পশু স্বাস্থের মান উন্নয়ন একটি সহজতর উপায়। বলতে গেলে খড়ই গবাদি পশুর একমাত্র খাদ্য। খড় একটি নিম্নমানের আঁশযুক্ত বা ছোবরা জাতীয় খাদ্য এবং এতে আমিষের ভাগ যেমন কম তেমনি একে হজম করাও অত্যন্ত কষ্টকর। একটু তৎপর হলেই এ সমস্যার অনেকটা সমাধান করা সম্ভব। যেমন এ খড়কে যদি ইউরিয়া দিয়ে নিদিষ্ট পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করা যায়, তবে এর খাদ্যমান প্রায় দিগুণ বাড়িয়ে অন্যান্য দানা খাদ্যের অভাব অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় খড় খাওয়ালে গবাদি পশু সমপরিমাণের সাধারণ খড় অপেক্ষা অধিক পুষ্টি পেয়ে থাকে।

ইউরিয়ার পরিচিতি

ইউরিয়া প্রস্তুত করণে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমোনিয়া গ্যাসের সহিত উচ্চ চাপে ও ২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মিশানো হয়। বিক্রিয়াটি দু'ধাপে সম্পন্ন হয় এবং এর ফলে স্বচ্ছ স্ফটিকাকার কঠিন ইউরিয়া তৈরী হয়।

$$2NH_3 + CO_2 \longrightarrow \underset{\text{(ইউরিয়া)}}{CON_2H_4} + H_2O$$

যদিও দানা ইউরিয়াতে ০.২% জলীয় অংশ আছে তবুও লবণের মত বাতাসের জলীয় পদার্থ শোষণ করে না। ইউরিয়ায় ৪৬.৬% নাইট্রোজেন রয়েছে। ইউরিয়া সার পশু খাদ্যে ব্যবহৃত হলে ২৮৭% সমমানের (৪৬.৬ x ৬.২৫) অপরিপক্ক আমিষ (crude protein) পাওয়া যেতে পারে। পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলে ইউরিয়া হাইড্রোলাইজড হয়ে এমোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এ পরিণত হয়।

$$CO\text{-}(NH_2)_2 \longrightarrow NH_3 + CO_2$$

ইউ.এম.এস তৈরীর পদ্ধতি

- ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পর্দাথের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে।
- সহজ ভাষায় যতটুকু খড় মিশ্রিত করব তার অর্ধেক পরিমান পানি, পানির অর্ধেক পরিমান মোলাসেস/নালী/চিটা এবং প্রতি কেজি খড়ের জন্য ৩০ গ্রাম ইউরিয়া নিতে হবে।
- যেমন, ১০ কেজি খড়ের জন্য ৫ লিটার পানি, ২.৫ কেজি মোলাসেস এবং ৩০০ গ্রাম (১০ x ৩০ গ্রাম) ইউরিয়া লাগবে।
- প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমান মেপে নিতে হবে।
- মোলাসেস ও ইউরিয়া ওজনের পর প্রয়োজন মত পরিস্কার পানিতে এমনভাবে মিশাতে হবে যাতে সম্পূর্ণ দ্রবণটুকু খড়ের সাথে সহজে মিশানো যায়।
- শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরনা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবন চুষে নেয়। এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবন সমভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

সারনী ৭.১ঃ ইউ.এম.এস প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন উপাদানের আনুপাতিক হারঃ

শুকনো খড়	পানি	চিটা/নালী গুড়	ইউরিয়া
৫ কেজি	২.৫ থেকে ৩.৫ লিটার	১ কেজি ২০০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
১০ কেজি	৫ থেকে ৭ লিটার	২ কেজি ৪০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম
২০ কেজি	১০ থেকে ১৪ লিটার	৪ কেজি ৮০০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম
৫০ কেজি	২৫ থেকে ৩৫ লিটার	১২ কেজি	১ কেজি ৫০০ গ্রাম
১০০ কেজি	৫০ থেকে ৭০ লিটার	২৪ কেজি	৩ কেজি

ব্যবহার পদ্ধতি

- ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরী ইউ.এম.এস সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তেও খাওয়ানো যায়।
- তবে ২/৩ দিনের খড় একবারে তৈরী করলে ইউ এম এস পলিথিন দ্বারা ভালভাবে ঢেকে রাখতে হবে

খাওয়ানোর পরিমান

গরুকে তার ইচ্ছা অণুযায়ী, অর্থাৎ একটি গরু যে পরিমান খেতে পারে সে পরিমান ইউ এম এস সরবরাহ করতে হবে। তবে গরুকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে নেওয়া ভাল।

ইউরিয়া রূপান্তরের কলাকৌশল

১ম স্তর : ইউরিয়া $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ এমোনিয়া + কার্বণ ডাইঅক্সাইড

২য় স্তর : শর্করা $\xrightarrow{\text{জীবাণু নিঃসৃত পাচক রস}}$ উদ্বায়ী ফ্যাটি এসিড + কিটো এসিডস

৩য় স্তর : এমোনিয়া + কিটো এসিডস $\xrightarrow{\text{পাচক রস}}$ এমাইনো এসিড

৪র্থ স্তর : এমাইনো এসিডস $\xrightarrow{\text{পাচক রস}}$ মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন

৫ম স্তর : মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন $\xrightarrow{\text{এবোমেজাম ও ক্ষুদ্রান্ত্রের পাচক রস}}$ মুক্ত এমাইনো এসিড

শেষ স্তরে জাবর কাটা প্রাণী এর দেহের প্রয়োজনীয় আমিষ উৎপাদন করার জন্য ক্ষুদ্রান্ত হতে মুক্ত এমাইনো এসিড শোষণ করে।

কোন কোন অবস্থায় ইউরিয়া খাওয়ানো নিষেধ

১। ছয় মাসের নীচের বাছুরকে।

২। অসুস্থ পশুকে।

৩। সালফার জাতীয় ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার পর অন্ততঃ পরবর্তী ১৫ দিন হতে এক মাস পর্যন্ত। (ডায়রিয়ার চিকিৎসায় সালফার দ্বারা চিকিৎসা করলে) ইউ.এম.এস বন্ধ রাখতে হবে।

৪। গর্ভকালীন অবস্থার শেষ দিকে।

৫। ইউরিয়া খাওয়ানোর পর অসুবিধা দেখা দিলে বা এলার্জি হলে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ

ক) অতিরিক্ত লালা ঝরা বা লোল পড়া।

খ) ঘন ঘন বা বারে বারে প্রস্রাব বা মলত্যাগ করা।

গ) পেট ফুলে যাওয়া।

ঘ) শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া।

ঙ) দেহের বিভিন্ন অংগের মাংস কাঁপতে থাকা।

চ) সম্মুখের পা খোঁড়াতে থাকা।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সর্তকতা

- অবশ্যই ইউ.এম.এস তৈরী করার সময় ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউ.এম.এস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না। প্রয়োজনে ধীরে ধীরে ইউরিয়ার মাত্রা বাড়িয়ে নির্ধারিত মাত্রায় ইউরিয়া ব্যবহার করা। এতে প্রাণীও অভ্যস্ত হয়ে যাবে, কারণ ইউরিয়া তিক্ত স্বাদযুক্ত।

নিম্নে আমিষ জাতীয় খাদ্যের ক্রিয়া দেখানো হলো-

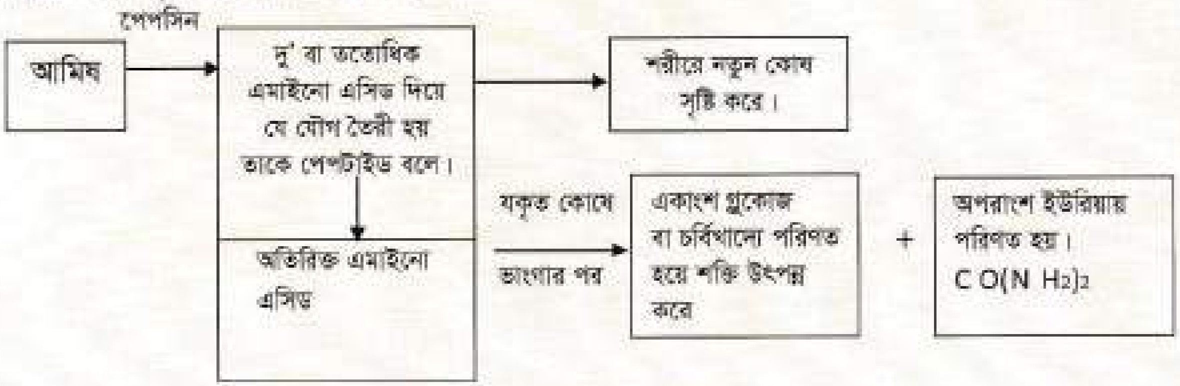

ভূট্টা খড়ের সংরক্ষণ ও ব্যবহার

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগে প্রচুর ভূট্টা চাষ হয়। শুধুমাত্র রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে ২২১১০ হেক্টর জমিতে ভূট্টা চাষ করা হয়। দেশের মোট ভূট্টা উৎপাদন এলাকার যথাক্রমে ৫৪ শতাংশ (১৫ লক্ষ হেক্টর) এবং ২৫ শতাংশ (৭ লক্ষ হেক্টর) এলাকা রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের এলাকা। হাইব্রিড ভূট্টা হতে রবি ও খরিপ মৌসুমে প্রতি হেক্টরে দানা উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৬-১০ টন ও ৪-৫ টন। তাছাড়া প্রতি ঋতুতে প্রতি হেক্টরে ভূট্টার খড় (যাকে মেইজ স্টোভার বলে) উৎপন্ন হয় ২৫-৫০ টন। এক চতুর্থাংশ জায়গার ভূট্টার খড়ও যদি সাইলেজ করা হয় তা থেকে মোট সাইলেজ উৎপাদন হতে পারে ৮৮,৪৪০০ টন। এই বিপুল পরিমান উচ্ছিষ্ট পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে পশুখাদ্যের অভাব দূরীকরনসহ পশুজাত উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বহুলাংশে কমানো সম্ভব হবে। হাইব্রিড ভূট্টার খড় ভূট্টার দানা সংগ্রহ করার পরও সবুজ ও সতেজ থাকে। ফলে খড়ের পুষ্টিমানও ভাল থাকে। ভূট্টা রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) ও খরিপ (মার্চ-অক্টোবর) উভয় মৌসুমেই জন্মে। তাই ভূট্টার খড় হতে বছরে দু'বার সাইলেজ করা যায় এবং সারাবছর পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কোন রকম দ্রব্যাদি যোগ করা ছাড়াই ভূট্টার খড়ের সাইলেজ তৈরী করা যায়, তবে মোলাসেস অথবা ইউরিয়া যোগ করে সাইলেজ তৈরী করলে সাইলেজের পুষ্টিমানও বাড়ে এবং অধিককাল সংরক্ষণও করা যায়। তাই এ সমস্ত এলাকায় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূট্টা দানা ও খড় ব্যবহার করে ডেইরী, বীফ, লেয়ার, ব্রয়লার ও ছাগল উৎপাদন সম্ভব।

ভূট্টা খড় সংরক্ষণ

ভূট্টা গাছ হতে পরিপক্ক ভূট্টার মোচা উঠানোর পর সাইলেজ করার জন্য ভূট্টা গাছ কর্তন করা হয়। ভূট্টা গাছ কর্তনের পর ভালভাবে সাইলেজ করার জন্য ভূট্টা গাছকে ট্রাক্টর চালিত চপার মেশিন বা দা দিয়ে ৭ - ১০ সেঃমিঃ সাইজে টুকরো করা হয়। একটি সাইলো পিটের আকৃতি হতে পারে এরূপ যেমন- ৩ ফুট গভীর, তলদেশে ৩ ফুট প্রশস্ত, মধ্যভাগে ৮ ফুট প্রশস্ত এবং উপরিভাগে ১০ ফুট প্রশস্ত। এভাবে তৈরীকৃত ১০০ বর্গফুটের একটি সাইলো পিটে ২.৫-৩০ টন ঘাস সাইলেজ হিসাবে সংরক্ষণ করা যায়। সাইলো পিট উঁচু জায়গায় করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি জমা হতে না পারে এবং পানি গড়িয়ে চলে যেতে পারে। তাছাড়া পিটের ভিতর সাইলেজ যেন আটশাট অবস্থায় থাকে এবং বাতাস ও পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

মেইজ স্টোভার সংগ্রহের উপযুক্ত সময়

মেইজ স্টোভার সাইলেজ সংরক্ষণ

ভূট্টা খড় উৎপাদন ও আয়

প্রতি হেক্টর জমিতে ভূট্টার খড় উৎপাদন সাধারণতঃ ২৫-৩০ টন। প্রতি হেক্টর জায়গার ভূট্টার খড় কাটা, টুকরো করা, সাইলো পিট এবং সাইলেজ তৈরী করতে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় ২৪-৩০ জন। শ্রমিক ও সাইলেজ তৈরীর পলিথিন বাবদ মোট খরচ হয় ৩৪৬০/- এক হেক্টর জায়গায় উৎপাদিত সাইলেজ দিয়ে ১০ টি গাভীর ৪-৫ মাসের রাফেজ (খড় বা ঘাস) জাতীয় খাবারের চাহিদা মেটানো যায়। তাই এক হেক্টর জায়গার ভূট্টার খড় যেগুলো হয়তো অব্যবহৃতই থাকতো তা দিয়ে ৩০,০০০/- টাকার অধিক গো-খাদ্য উৎপাদন করা যায়। সুতরাং ভূট্টা দানা হতে আয় ছাড়াও শুধুমাত্র ভূট্টার খড় সাইলেজ হিসেবে ব্যবহার করলে প্রতি হেক্টরে ২৬৫৪০/- নীট আয় সম্ভব। রবি ও খরিপ মৌসুমে বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগের এলাকা সমূহে প্রযুক্তিটি প্রয়োগ করে স্বল্প খরচে দুগ্ধ ও গরু মোটাতাজাকরণ খামার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

টি.এম.আর খাদ্য প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি

টি.এম.আর কি?

শস্য-উপজাত ও দানাদার খাদ্যের ঘণীভূত সংমিশ্রণে গঠিত পরিপূর্ণ সুষম খাদ্যই হচ্ছে টি.এম.আর (টোটাল মিশ্রত রেশন)। এটি এমন এক প্রকার খাদ্য যা গ্রহণে গবাদি প্রাণীর সকল পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তিই নিশ্চিত হয়। টি.এম.আর দানাদার এবং আঁশজাতীয় খাদ্যের সমম্বয়ে গঠিত যা প্রাণীকে ২৪ ঘন্টাই সরবরাহ করা যায়, ফলে অন্য কোন বাড়তি খাবার দেয়ার প্রয়োজন নেই, কারন এতে প্রাণীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় সকল পুষ্টি উপাদানই (মাইক্রো ও ম্যাক্রো) সুষম আকারে সন্নিবেশিত থাকে। শস্যের অবশিষ্টাংশ যা সাধারনতঃ পুড়িয়ে ফেলা হয় কিংবা জমিতে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, এগুলো কাজে লাগিয়ে টি.এম.আর প্রস্তুত করায় খাদ্যের খরচ কমে আসে।

কেন টি.এম.আর?

এই খাদ্য প্রযুক্তিটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি প্রাণীর বাছাই করে খাওয়ার প্রবণতা দূর করে খাদ্য অপচয় রোধ করে প্রাণীর সুষম খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করে। অর্থাৎ, গবাদি প্রাণী কর্তৃক এর প্রতিটি কামড়েই রয়েছে সকল পুষ্টি উপাদান। এটি গবাদি প্রাণীর দেহের পাকস্থলির পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ঠিক রেখে পাকস্থলিতে খাদ্যের সঠিক গাঁজন নিশ্চিত করে পরিপাচ্যতা বৃদ্ধি, সঠিক অ্যামোনিয়া মুক্তকরনের মাধ্যমে নাইট্রোজেনের ভারসাম্য রক্ষা এবং কম মানের আঁশজাতীয় খাদ্যের গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে প্রানীর দুধ ও মাংসে উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায় এবং খাদ্য খরচ কমে গিয়ে খামারের মুনাফা বেড়ে যায়। এটি তৈরি করে বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ করা এবং সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পরিবহন করা যায়। সুতরাং গবাদি প্রাণী পালনকারী খামারিদের জন্য এটি একটি চমকপ্রদ খাদ্য প্রযুক্তি।

টি.এম.আর প্রস্তুতে খাদ্যোপাদান বাছাই

টি.এম.আর প্রস্তুত করণের পূর্বে খামারিকে আগে খাদ্যোপাদান বাছাই করতে হবে। টি.এম.আর প্রস্তুত করতে দুই ধরনের খাদ্যোপাদান লাগে যথাঃ ক) আঁশজাতীয় খাদ্য যেমনঃ শুকনা খড় (ধান, গম, সয়াবিন ইত্যাদি), মেইজ স্টোভার (ভুট্টা সংগ্রহ করার পরে অবশিষ্ট গাছের অংশ), 'সাইলেজ' বা 'হে' যে কোন একটি বা উভয়টি এবং খ) দানাদার খাদ্য মিশ্রন যেমনঃ গমের ভুষি, চালের কুঁড়া, ভুট্টা ভাঙ্গা, সয়াবিন মিল, খেসারি বা অন্য কোন ডালের ভূষি, তিল বা সরিষার খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, লালীগুড়, ডিসিপি, লবন, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ইত্যাদি। দুই ধরনের খাদ্যোপাদান বাছাই করার পরে খাদ্যের অনুপাত নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রাণীর জাত, প্রকার (মাংস বা দুধ উৎপাদনকারী), বয়স এবং উৎপাদনের পর্যায় অনুসারে আঁশজাতীয় ও দানাদারের মিশ্রনে তারতম্য হয়ে থাকে। সাধারনতঃ আঁশ ও দানাদারের অনুপাত ৭০:৩০ বা ৬০:৪০ বা ৫০:৫০ হয়ে থাকে। তবে আমাদের দেশের জন্য ৬০:৪০ অনুপাতই হচ্ছে সবচেয়ে অর্থনৈতিক সাশ্রয়ী। যে সকল খাদ্যোপাদান সহজলভ্য এবং মূল্য তুলনামূলকভাবে কম সেগুলো বাছাই করে উপাদান গুলোর রাসায়নিক মান তথা পুষ্টিমান কত তা জেনে নিতে হবে। সেটার জন্য প্রাণিপুষ্টি বিশেষজ্ঞের সরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে কিংবা কোন পুষ্টি গবেষণাগার থেকেও নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জেনে নেয়া যেতে পারে। গবেষণাগারে নমুনা বিশ্লেষণে প্রাপ্ত কিছু খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান সারণী-৭.২ এ দেওয়া হ'ল।

সারণী-৭.২: বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান

খাদ্য উপাদান	শুষ্ক পদার্থ (%)	আমিষ (%)	বিপাকীয় শক্তি (মেগা জুল /কেজি শুষ্ক পদার্থ)
গমের ভুষি	৮৭.৫	১৫.০	১০.৬
খেসারি ভুষি	৮৬.৫	১৩.০	৭.৭৫
চালের কুঁড়া	৯০.৫	১৪.০	১১.৮
ভুট্টার গুড়া	৯১.০	৯.৭	১২.৫
সয়াবিন মিল	৮৬.০	৪৪.০	১৩.৭
সরিষার খৈল	৮৬.০	৩৫.৭	১১.১১
তিলের খৈল	৯২.০	২৮.০	৮.৯১
লালীগুড়	৭৫.০	৫.০	১২.৫

খাদ্য উপাদান	শুষ্ক পদার্থ (%)	আমিষ (%)	বিপাকীয় শক্তি (মেগা জুল /কেজি শুষ্ক পদার্থ)
মেইজ স্টোভার	৮৯.০	৫.৫	৮.৯
শুকনা খড়	৯২.০	৪.০	৫.৫
সয়াবিনের খড়	৮৮.১২	২.৯৭	৬.০
সাইলেজ (নেপিয়ার)	৩২.০	৭.২	৮.৫
ডাল জাতীয় হে	৮৯.০	১৫.২	৮.৫
নেপিয়ার ঘাস	২০.০	৯.৪	৭.৫
জাম্বু ঘাস	১৬.০	১১.০	৭.৬
ভুট্টা ঘাস	২৫.০	৮.০	৯.৯

টি.এম.আর প্রস্তুত প্রণালী

প্রথম ধাপ

খাদ্যোপাদান বাছাই করার পরে আঁশ এবং দানাদার খাদ্যের অনুপাত ঠিক রেখে শতকরা ১৫-১৬ ভাগ আমিষ এবং প্রতি কেজি শুষ্ক খাদ্যে ১০-১২ মেগাজুল বিপাকীয় শক্তি সম্পন্ন একটি সুষম খাদ্যের মিশ্রণ প্রস্তুত করতে হবে। নিম্নে আঁশ এবং দানাদার খাদ্যের ৬০:৪০ এবং ৫০:৫০ অনুপাতের দুটি খাদ্য মিশ্রণ সারণী-৭.৩ ও ৭.৪ এ দেয়া হ'লঃ

সারণী-৭.৩: আঁশ ও দানাদারের অনুপাত ৬০: ৪০

খাদ্যের প্রকার	খাদ্যোপাদান/পুষ্টি	পরিমান
আঁশজাতীয় খাদ্য (৬০%)	নেপিয়ার সাইলেজ	৪৮.০ কেজি
	সয়াবিনের খড়	১২.০ কেজি
দানাদার মিশ্রণ (৪০%)	গমের ভুষি	৫.০ কেজি
	ভুট্টার গুড়া	১৭.০ কেজি
	সয়াবিন মিল	১৫.০ কেজি
	ডি.সি.পি.	২.৫ কেজি
	খাবার লবণ	০.৫ কেজি
	মোট পরিমাণ (জলীয় অংশ সহ)	১০০.০ কেজি
পুষ্টি উপাদান	মোট পরিমাণ (জলীয় অংশ বাদে)/মোট শুষ্ক পদার্থ	৬১.৫৪ কেজি
	আমিষের পরিমাণ (শতকরা)	১৫.৩৭ %
	মোট বিপাকীয় শক্তি (প্রতি কেজি শুষ্ক পদার্থে)	৯.৯২ মেগাজুল

সারণী-৭.৪: আঁশ ও দানাদারের অনুপাত ৫০: ৫০

খাদ্যের প্রকার	খাদ্য উপাদান/পুষ্টি	পরিমান
আঁশজাতীয় শস্য-উপজাত (৫০%)	মেইজ স্টোভার (ভুট্টার খড়)	৫০ কেজি
দানাদার মিশ্রণ (৫০%)	গমের ভুষি	০৮ কেজি
	খেসারীর ভুষি	০৪ কেজি
	সয়াবিন মিল	২৫ কেজি
	লালীগুড়	১০ কেজি
	ডি.সি.পি.	২.৫ কেজি
	খাবার লবণ	০.৫ কেজি
	মোট পরিমাণ (জলীয় অংশ সহ)	১০০.০ কেজি
পুষ্টি উপাদান	মোট পরিমাণ (জলীয় অংশ বাদে)/মোট শুষ্ক পদার্থ	৮৬.৮১ কেজি
	আমিষের পরিমাণ (শতকরা)	১৫.৮৮ %
	মোট বিপাকীয় শক্তি (প্রতি কেজি শুষ্ক পদার্থে)	১০.২০ মেগাজুল

দ্বিতীয় ধাপ

আঁশ ও দানাদার খাদ্যের অনুপাত অনুযায়ী আমিষ ও শর্করার মাত্রা ঠিক রেখে খাদ্যোপাদানের পরিমান নির্ধারণ করার পরে আঁশজাতীয় খাদ্যগুলোকে ভালভাবে চপিং/গ্রাইন্ডিং করে নিতে হবে। এগুলো একদম পাউডারও হবেনা আবার বেশি বড়ও থাকা চলবেনা। মনে রাখতে হবে, আঁশ-জাতীয় খাদ্যের সাথে দানাদার খাদ্য যাতে সুষমভাবে মেশানো যায়, এমন মাত্রায় চপিং/গ্রাইন্ডিং করতে হবে। অধিকন্তু, ব্লক করলে যাতে সবগুলো উপাদান আঁটসাঁটভাবে জমাট বেঁধে থাকে, ঝুরঝুরে না হয়ে যায়।

চপিংকৃত সয়াবিন স্ট্র

চপিংকৃত সাইলেজ

তৃতীয় ধাপ

অতঃপর সকল উপাদানগুলোকে ভালভাবে মিশ্রিত করে নিতে হবে। মিক্সার মেশিন হলে ভাল হয়, নতুবা হাত দ্বারা মিশ্রন করলেই তা গবাদিপশুর খাওয়ার উপযুক্ত একটি পরিপূর্ণ খাদ্য মিশ্রন হয়ে গেল। আর যদি তা ব্লক (টি.এম.আর. ব্লক) আকারে করা হয়, তবে পূর্বে মিশ্রিত খাদ্য উপাদানের সাথে লালীগুড়ের সমপরিমান পানি মিশ্রিত করে তা ভালভাবে মিশিয়ে (৯×৯×৯) সে.মি. মাপের একটি কাঠ বা লোহার ছাঁচে ঢেলে কিছুক্ষণ চাপ দিয়ে ইটের মত খাদ্য ব্লক তৈরি করা হয় যেটির ওজন মোটামুটি ৫ কেজির মত হবে। এরপর ব্লকটিকে কিছুটা শুকিয়ে পলিথিনে মুড়িয়ে কয়েক দিনের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রস্তুতকৃত টি.এম.আর যদি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা হয়, তবে মিশ্রণের সময় খাদ্যোপাদানের সহিত নির্দিষ্ট মাত্রানুযায়ী এন্টি-মাইক্রোবিয়াল/এন্টি-ফাংগাল বা মোল্ড ইনহিবিটর ব্যবহার করা যেতে পারে। বাজারে এ ধরনের অনেক জৈব কিংবা অজৈব উপাদান পাওয়া যায়।

খাদ্য মিশ্রন

প্রস্তুতকৃত টি.এম.আর

হাইড্রলিক মেশিনে ব্লক তৈরি

হ্যান্ড মেশিনে ব্লক তৈরি

প্রস্তুতকৃত খাদ্য ব্লক

গাভীকে টি.এম.আর প্রদান

গরুকে টি.এম.আর খাওয়ানো

যদি ম্যাশ আকারে তৈরী করা হয় তবে প্রস্তুতকৃত টি.এম.আর বানানোর পর পরই গরুকে খাওয়ানো যায়। আর ব্লক টি.এম.আর হলে মোড়ানো প্যাকেট (পলিথিন কিংবা কাগজ) খুলে সরাসরি গরুর চাড়িতে দিতে হবে, সেগুলো ভেঙ্গে কিংবা পানির সাথে মিশিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। দুধের গাভির ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সারাদিনে নির্দিষ্ট পরিমানে টি.এম.আর খাবার সরবরাহ করতে হবে। গাভী বেশি খেতে চাইলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেয়া যাবেনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিলে দেহে চর্বি বেড়ে গিয়ে প্রজনন দক্ষতা হ্রাস পেতে পারে। আর মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে গরু প্রত্যহ সর্বোচ্চ যতটুকু খেতে পারে ততটুকু দেয়া যেতে পারে। টি.এম.আর এর সাথে অন্য কোন খাদ্য দেওয়া যাবে কিনা? হ্যাঁ, যদিও টি.এম.আর একটি পরিপূর্ণ খাদ্য, যেটি পরিমানমত দিলে আর বাড়তি খাদ্য দেয়ার প্রয়োজন নেই, তবে দুধের গাভীর ক্ষেত্রে কেউ যদি কাঁচাঘাস দিতে চায় তবে তা দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে টি.এম.আর সুনির্দিষ্ট পরিমানে কম সরবরাহ করলেই হবে। টি.এম.আর যেহেতু শুকনা জাতীয় খাদ্য, তাই গরুকে পর্যাপ্ত পরিমানে পরিষ্কার পানি খেতে দিতে হবে।

সতর্কতা

টি.এম.আর প্রস্তুত করার সময় নির্বাচিত সকল খাদ্যোপাদানের গুণগত মান দেখে নিতে হবে। সেগুলো যাতে দুর্গন্ধ, ময়লা, ধুলাবালি কিংবা অনেক দিনের পুরানো ফাংগাসযুক্ত না হয়। সেজন্য খাদ্যোপাদানের রং এবং গন্ধ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি ম্যাশ আকারে টি.এম.আর প্রস্তুত করা হয়, তবে তা বানানোর ২-৩ দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে। টি.এম.আর এ জলীয় পানির পরিমান বেশি থাকলে সেখানে সহজেই ফাংগাস জন্মাতে পারে, তাই বানানোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণীকে তা খেতে দিয়ে শেষ করতে হবে। টি.এম.আর বানানোর পরে তা উন্মুক্ত না রেখে ঢেকে রাখতে হবে যাতে ইদুর, পাখি, মাছি (লালীগুড়ের কারণে) বা পোকামাকড় না লাগে। কারণ, এগুলো লাগলে খাদ্য দূষিত হয়ে প্রাণীর পরিপাকে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

টি.এম.আর. এর কার্যকারিতা

দুধের পরিমান ও গুণাগুণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে

গবেষণায় দেখা গেছে যে, টি.এম.আর. খাওয়ানোর ফলে গাভীর দুধ উৎপাদন ১২-১৫% এবং দুধে ননীর পরিমান ৭-১০% বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও গাভীর আর্থিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, টি.এম.আর. এর বি.সি.আর (আয়-ব্যয় অনুপাত) ১.৩৮, অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করলে আয় হয় ১.৩৮ টাকা (মুনাফা শতকরা ৩৮ ভাগ)।

মাংস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে

বাড়ন্ত দেশি ষাঁড় বাছুরের প্রত্যহ মাংশ বৃদ্ধি যেখানে ৪০০-৫০০ গ্রাম, সেখানে টি.এম.আর. খাওয়ানোর ফলে তার প্রত্যহ দৈহিক বৃদ্ধি হয় ৭০০-৮০০ গ্রাম। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে টি.এম.আর এবং প্রচলিত খাদ্যের তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রচলিত খাদ্য খাইয়ে ষাঁড় গরুর প্রত্যহ দৈহিক গড় বৃদ্ধি যেখানে ৬০০ গ্রাম, সেখানে টি.এম.আর খাওয়ানো ষাঁড় গরুর প্রত্যহ দৈহিক সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ১২৫০ গ্রাম যা গড়ে প্রায় ৯৫০ গ্রাম। একই গবেষণায় দেখা যায় টি.এম.আর এর খাদ্য রুপান্তর দক্ষতা ৬.৬৭ (অর্থাৎ প্রত্যহ ৬.৬৭ কেজি শুষ্ক খাদ্য ১ কেজি মাংসে রুপান্তরিত হয়), অন্যদিকে প্রচলিত খাদ্যের রুপান্তর দক্ষতা প্রায় ১২.০। এছাড়াও গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে বি.সি.আর (আয়-ব্যয় অনুপাত) ২.৪, অর্থাৎ ১ টাকা খরচ করলে আয় হয় ২.৪০ টাকা।

উপসংহার

টি.এম.আর. খাদ্য প্রযুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ শস্য-উপজাতের অপচয় রোধ করে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এর পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে গবাদি প্রাণীর বিশাল খাদ্য ঘাটতি পূরণে এটি সহায়ক।

ফডার গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা ১৩৪১।